আলোর পথে যাত্রা

ঐশি বাণীঃ বিস্ময়কর সত্য নাকি অন্ধ কুসংস্কার?

সংকলন ও সম্পাদনায়

নাজমুস সাকিব

ভূমিকা

ছোটখাটো এই লেখাটি কোনভাবেই একজন মানুষের চিন্তাচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও বদ্ধমূল ধারণা বদলাতে সক্ষম নয়। এক মুহূর্তে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কখনই বদলায় না। বদলে যাওয়া একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধীরে ধীরে ছোট ছোট অসংখ্য ঘটনা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে মানুষের চেতনায় পরিবর্তন আসে।

এই ছোট্ট লেখাটি তেমনই একটি ছোট্ট প্রয়াস। এটা সত্য সন্ধানী কারো মনোজগতে রাতারাতি পরিবর্তন কখনই আনবেনা। তবে সত্যিকার অর্থেই যদি কেউ সত্য সন্ধানী হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই তাকে নতুন করে ভাববার প্রয়াস জাগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

সংকলক

শুরুর কথা

প্রিয় পাঠক,

আজ আপনাকে এমন কিছু বলতে এসেছি, যা হয়তো আপনার কাছে খুব বিরক্তিকর ও সময়ের অপচয় বলে মনে হবে। এমন কিছু যা আমরা আমাদের প্রতিনিয়ত জীবনের ব্যস্ত সময়গুলোর মাঝে স্থান দেবার মত যোগ্য মনে করিনা। এমন কিছু যা আমাদের ছুটে চলা জীবন গাড়িটার ভেতরে জায়গা করে নিতে পারেনা। আসলেই। আমাদের অনেকের কাছেই তা অত্যন্ত তুচ্ছ। এটা নিয়ে ভাবার কোন দরকার নেই। একদম অপ্রয়োজনীয়। হবেই বা না কেন। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত এই পুরো সময়টাতে দম ফেলার মত সময় কি আছে? কত কাজ আমাদের। ক্লাস, অফিস, পরিবার পরিজন, সামাজিক ব্যাপারস্যাপার, ব্যবসাবাণিজ্য কত দুশ্চিন্তা! এর মাঝে কি আবার এই ধরণের কথা চিন্তা করার জো আছে? নেই।

তো কথাটা কি?

কথাটা হল আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন। শুনতেই খুব ভারী ভারী লাগছে, তাই না? আসলেই তাই। বেশ দার্শনিক একটা ভাব আছে বিষয়টার মধ্যে। শুনলেই মনে হয় মোটা মোচ আর ভারী ফ্রেমের চশমাঅলা কোন প্রফেসর এই বুঝি শুরু করলেন লেকচার।

কিন্তু আসলেই কি তাই?

চলুন আমরা আজকে আমাদের 24/7 ছুটে চলা এ জীবনের কিছুটা মুহূর্ত আলাদা করে ফেলি। আজকের এই কিছুটা মুহূর্ত আমরা খরচ করবো একটা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পেছনে। অন্তত আমাদের কাছে যেটা প্রতিদিনের জীবনে কোন মূল্য রাখেনা, সেটা নিয়ে। কি এসে যায় কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট হলে? কত কিছুই তো করি সময় নষ্ট করতে। আজকে না হয় এই গম্ভীর টপিকেই নষ্ট করলেন? চলুন তাহলে!

আচ্ছা ভাবুন তো, আমাদের পৃথিবীতে আগমন নিয়ে আগে কি কখনো ভেবেছেন? খুব সম্ভবত গভীরভাবে ভাবা হয়নি, তাই না? হলেও কতটা গভীরভাবে ভেবেছেন? নাকি একদমই ভাবেন নি?

যেভাবেই ভেবে থাকুন না কেন, এই ধরণের টপিকে কম বেশি সব ভাবনার শেষে কিছু কমন প্রশ্ন চলে আসবে। এবং মানুষ হিসেবে, একটি মানবিক, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে আমাদের এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া বাঞ্ছনীয়। চলুন আমরা প্রশ্নগুলো এক নজরে দেখে নেই। মূলত আমাদের প্রশ্নগুলোকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা যায়।

১. আমরা কিভাবে অস্তিত্বে এলাম?
২. এই পৃথিবী, এই সমগ্র সৌরজগৎ, এই মহাবিশ্ব কিভাবে এল?

দেখলেন তো! আবার সেই দার্শনিক টাইপ কথাবার্তা চলে এল। আগামী কিছু সময় নিজেকে এই দর্শনের সাথে অভ্যস্ত করে নিন। তাহলে সময়টা আরো উপভোগ করবেন।

চলুন আমরা এবার প্রশ্নগুলোর বিশ্লেষণে যাই। এখানে এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দুইভাবে দেয়া যায়। প্রথম প্রকার উত্তর হল যেটা এখনই আপনার মাথায় গিজগিজ করছে। আপনার উত্তরটা তাই আমিই বলে দিই।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল আমরা পুরুষ ও স্ত্রী মিলনের ফলে *জৈবিকভাবে* জন্ম নিই, অস্তিত্বে আসি, যার একটি *সুনির্ধারিত* জৈবিক পদ্ধতি রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে Big Bang বা মহাজাগতিক প্রসারণের ফলে। ব্যাস। হয়ে গেল উত্তর। অতি সহজ।

কিন্তু ভাবুন তো, এখানে শুভঙ্করের ফাঁকিটি কোথায়?

না পারলে আসুন, সাহায্য করি। এখানে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে আমরা "কিভাবে" হয় বলেছি। "কেন" হয় বলিনি।

ধরুন আপনি আমাকে বললেন, আচ্ছা, কোকিল এত সুন্দর করে বসন্তে গান গায় কেন? আমি উত্তর দিলাম, কারণ কোকিলের ঠোঁটের গঠন এমন, যখন তার ভেতর থেকে কোন *শব্দ* বের হয়, তা তার মুখগহ্বরে এমন উপায়ে এদিক ওদিক হয়ে ধ্বনিত হয়, যা শুনতে খুব সুন্দর গানের মত মনে হয়।

আপনার যদি খুব সুক্ষ্মভাবে খেয়াল করার অভ্যাস না থাকে, তাহলে আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন। আমার উত্তর অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত ও যথার্থ। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার প্রশ্নের *"কেন"* অংশের উত্তর আমি *"কিভাবে"* দিয়েই চালিয়ে দিয়েছি। অথচ আমার উত্তরটা আরো বিশ্লেষিত উপায়ে *"কেন"* দিয়েই উত্তর দেয়া উচিৎ ছিল। আসুন এবার উত্তরটা আরো বিশ্লেষিত করি।

কোকিলের ঠোঁটের গঠন এমন, যখন তার ভেতর থেকে কোন শব্দ বের হয়, তা তার মুখগহ্বরে এমন উপায়ে এদিক ওদিক হয়ে ধ্বনিত হয়, যা শুনতে খুব সুন্দর গানের মত মনে হয়। আর সে এত সুন্দর করে এই *শব্দ* বের করে কারণ বসন্ত হল কোকিলের মিলনের সময়। এই সময় পুরুষ কোকিল স্ত্রী কোকিলকে মিলনে আকৃষ্ট করতে এই সুন্দর *শব্দ* সৃষ্টি করে। যখনই সে কোন স্ত্রী কোকিলকে পেয়ে যায়, অমনি সে তার সুমধুর ডাক বন্ধ করে দেয়।

খেয়াল করে দেখুন। আমার প্রথম উত্তর কিন্তু ভুল ছিলনা। সঠিকই ছিল। কিন্তু তা *পরিপূর্ণ* ছিলনা। তাৎপর্যপূর্ণ ও সম্পূর্ণ ছিলনা। কিন্তু দ্বিতীয় উত্তর ছিল সম্পূর্ণ। কারণ এতে আমি "কিভাবে" ও "কেন" দুই বিষয়েরই অবতারণা করেছি।

এবার তাহলে চলুন একটু পিছে চলে যাই। আমাদের অস্তিত্ব ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি নিয়ে প্রশ্নটায়। সেটার উত্তর ও আমি দিয়েছি "কিভাবে" দিয়ে, "কেন" দিয়ে নয়। তাহলে আমাদের উত্তর কি *পরিপূর্ণ* হল?

না।

তাহলে পরিপূর্ণ উত্তর কি হবে? চলুন তবে আমরা মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রশ্নে যাই।

- মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হল?

  উত্তর হল মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে Big Bang বা মহাজাগতিক প্রসারণের ফলে।

- Big Bang বা মহাজাগতিক প্রসারণ কিভাবে হল? এর আগে মহাবিশ্ব কেমন ছিল?

  এটার সবচে সহজবোধ্য উত্তর হল, সমগ্র মহাবিশ্ব অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘন অবস্থায় ছিল। এই অবস্থা থেকে হঠাৎ মহাজগৎ প্রসারিত হতে শুরু করলো ও ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছল। এটি প্রায় ১৩.৭৫ বিলিয়ন বছর আগের কথা।

- কেন এই Big Bang বা মহাজাগতিক প্রসারণ?

এই প্রশ্নের কোন গ্রহণযোগ্য সদুত্তর নেই। বিজ্ঞানীরা এখনও এই বিষয়ে *ধারণাগত* পর্যায়ে আছেন। প্রমাণিত সত্যে কোন কারণে পৌঁছাতে পারেন নি।

আসুন আমরা প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

- আমরা কিভাবে অস্তিত্বে এলাম?

  আমরা পুরুষ ও স্ত্রী মিলনের ফলে *জৈবিকভাবে* জন্ম নিই, যার একটি *সুনির্ধারিত জৈবিক* পদ্ধতি রয়েছে।

- এই *জৈবিক পদ্ধতি* কিভাবে কাজ করে?

  নানা রকম *জৈবিক ক্রিয়া* ও *প্রতিক্রিয়া* - এর মাধ্যমে।

- এত *জৈবিক ক্রিয়া* ও *প্রতিক্রিয়া* কেন হয়?

  বিভিন্ন আণুবীক্ষণিক *কণা* আদান প্রদানের ফলে।

- এই আদান প্রদান কেন ঘটে?

  আদান প্রদানের সুযোগ থাকার ফলে।

- কেন এই সুযোগ সৃষ্টি হয়?

  বিভিন্ন রকম *ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া* ঘটার *অবস্থা* তৈরি হবার ফলে

- কেন এই *অবস্থা* তৈরি হতেই হবে?

  এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই।

আপাতত আমরা প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ করি। চলুন এই পর্বটা নিয়ে একটু আলোচনা করি।

আমরা উভয় প্রশ্নেই দেখলাম, একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তর থমকে যাচ্ছে। আমরা একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে যতই নতুন প্রশ্ন বের করে আনছি, ততই উত্তরের "কিভাবে" অংশটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এবং সব প্রশ্নের সর্বশেষ "কেন" অংশে গিয়ে উত্তর থেমে যাচ্ছে। চলুন এবার নতুন ধরণের একটা "কেন" প্রশ্ন করি আপনাকে।

বলুন তো, কেন সব প্রশ্নেরই উত্তর “কিভাবে হচ্ছে” বলার পরেও “কেন হচ্ছে” তার উত্তর দেয়া যাচ্ছেনা?

এর একটা সহজ সরল উত্তর হল, নিশ্চই এই সর্বশেষ “কেন হয়” অংশের কোন গৎবাঁধা বৈজ্ঞানিক উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞান সবসময় চেষ্টা করবে সব প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিতে, যাতে মনে হয় পুরো পদ্ধতিটাই একটি “অনিয়ন্ত্রিত” উপায়ে ঘটে। তাই বিজ্ঞান সেই প্রশ্নে এসেই থেমে যায়, যেখানে “অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে ঘটে” কথাটা বলা রীতিমত হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

তাহলে? এইসব কিছু কি নিয়ন্ত্রিত? কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে?

মহাবিশ্বের কথাই ধরুন। এই মহাবিশ্ব কি নিয়ন্ত্রিত? কেউ কি এই মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেছে? এই প্রশ্নের সোজাসুজি দুটি উত্তর রয়েছে।

উত্তর ০১: না

কোন কিছুকেই কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে না। এ মহাবিশ্ব যেমন আছে তেমনই। এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি, Big Bang বা *মহাজাগতিক প্রসারনের* কারণ, সব একটাই। তা হল দৈব প্রাকৃতিক উপায় (Random Natural Process)। অর্থাৎ দৈবভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে এর সৃষ্টি হয়েছে। এ মহাবিশ্ব Big Bang এর মত *প্রাকৃতিক* একটি কারণে *দৈব* ঘটনার ফলে *দৈব উপায়ের* মাধ্যমেই এমন *যথাযথ ও উপযুক্ত* অবস্থা লাভ করেছে। আরো প্রশস্ত উপায়ে বলি। সমগ্র মহাবিশ্ব যে এক জটিল ও মহাপরিপূর্ণ উপায়ে বিদ্যামান, যেখানে প্রতিটা গ্রহ অপর গ্রহ থেকে *যথাযথ ও উপযুক্ত* দূরত্বে বিদ্যমান, প্রতিটা গ্রহ অপর গ্রহকে একদম সূক্ষ্ম উপায়ে *পূর্ণ ভারসাম্যতায় থেকে* আকর্ষণ করছে, এই সবই হয়েছে দৈবক্রমে বা কোনরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়া। সোজা বাংলায় অনিয়ন্ত্রিত উপায়েই সমগ্র মহাবিশ্ব এই অবস্থা লাভ করেছে।

উত্তর ০২: হ্যাঁ

অর্থাৎ এই মহাবিশ্বকে কোন এক সত্ত্বা নিয়ন্ত্রণ করছে। সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ঘটছে।

প্রশ্ন হল, কোনটি সঠিক। নিশ্চই হ্যাঁ/না প্রশ্নোত্তরে একই সাথে দুইটি উত্তরই সঠিক হতে পারেনা। তাই যে কোন একটা উত্তরই হবে সঠিক। আসুন তবে আমরা কোন উত্তরটি সঠিক, সেটা বিবেচনা করার আগে কিছু *বৈজ্ঞানিক তথ্য* দেখে নিই।

- Big Bang *বা মহাজাগতিক প্রসারণের* পরে বিলিয়ন বছর ধরে মহাবিশ্বের Matter বা পদার্থগুলো এলোমেলোভাবে বিস্তৃত ছিল। কোন গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, সৌরজগত – কিছুই ছিলনা। শুধুমাত্র Atom বা মহাজাগতিক কণা মহাবিশ্বের শূন্যতায় এদিক

ওদিক ছুটে বেড়াতো। যখনই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে শুরু করলো, Gravity বা মহাজাগতিক আকর্ষণ Atom গুলোকে টানতে লাগলো। এইভাবে কোটি কোটি Atom একজোট হয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রহ, নক্ষত্র আর সৌরজগতে পরিণত হল। যদি এই মহাজাগতিক আকর্ষণ সামান্য পরিমাণও দুর্বল হত, Atom গুলো এতই দূরে দূরে সরে যেত, যে কখনই কোন গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি হতনা। আবার এই মহাজাগতিক আকর্ষণ যদি সামান্য পরিমাণও বেশি হত, তবে Atom গুলো এমন *শক্তিতে একে অপরের সাথে ধাক্কা লাগতো,* যে সমস্ত কিছু ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হত।

- যদি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের গতি সামান্য পরিমাণও বেশি হত, তবে মহাজাগতিক আকর্ষণ এর পক্ষে কোনকালেই Atom গুলোকে একত্র করে গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না। আবার যদি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের গতি সামান্য পরিমাণও কম হত, মহাজাগতিক আকর্ষণ এই সম্প্রসারণ শক্তিকে উপেক্ষা করে সব Matter বা পদার্থগুলো কে ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে আসতো আর *কৃষ্ণগহ্বর* (Black hole) এ পরিণত করতো। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী *স্টিফেন হকিনস* (Stephen Hawkins) তার *"কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"* (A brief History of Time) গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

  "বিগ ব্যাং এর এক সেকেন্ড পরে মহাজাগতিক সম্প্রসারণের মান/গতি যদি ১ লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন ভাগের ১ ভাগ পরিমাণও কম হত, তাহলে সমগ্র মহাবিশ্ব তার বর্তমান অবস্থায় আসার আগেই এর কেন্দ্রে বিলীন/বিস্ফোরিত হয়ে যেত।"

  "If the rate of expansion one second after the big bang had been smaller by even one part in a hundred thousand million million, the universe would have recollapsed before it ever reached its present size." [A Brief History of Time]

  অর্থাৎ, যদি Big Bang এর *এক সেকেন্ড* পরে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের গতি *এক লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়নের এক ভাগ* পরিমাণও কম হত, তবে মহাবিশ্ব আবার এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। তিনি এই সম্প্রসারণটির এই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর জটিল গতিতে পৌঁছানোর কারণ হিসেবে *শক্তির* (Energy) ঘনত্বকে নির্ধারক হিসেবে উল্লেখ করেন।

- পৃথিবী মানুষের জীবন ধারণের জন্যে উপযুক্ত হবার একটি মহামূল্যবান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পৃথিবীর ঘনত্ব। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের মুহূর্তে পৃথিবীর গঠনের ঘনত্ব যদি *০.০০০০০০০০০০০০১%* পরিমাণও এদিক ওদিক হত, তবে পৃথিবীর এই জীবন ধারণের উপযুক্ত উপযোগী বৈশিষ্ট্য থাকতো না। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা আরো তথ্য দিয়েছেন যে পৃথিবীতে জীবন ধারণের উপকরন গুলো এত অদ্ভুতরূপে পরিপূর্ণ উপায়ে অবস্থিত, যে একটিরও এলোমেলো হওয়া এই *প্রাকৃতিক ভারসাম্য*কে হুমকির মুখে ফেলে দেবে।

ব্রিটিশ মহাকাশবিদ, এডিল্যাড ইউনিভার্সিটির 'তাত্ত্বিক পদার্থ বিদ্যা'র *অধ্যাপক ডঃ পল ডেভিস* (Dr. Paul Davis) বলেন,

"এতে আমার জন্য শক্তিশালী প্রমাণ আছে যে নিশ্চই এসবের পেছনে কিছু একটা কাজ করছে... মনে হচ্ছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে কেউ যেন প্রকৃতির সংখ্যাগুলোকে একদম উপযুক্তভাবে সাজিয়েছে...এই নকশার প্রভাব অসাধারণ!"

"There is for me powerful evidence that there is something going on behind it all....It seems as though somebody has fine-tuned nature's numbers to make the Universe....The impression of design is overwhelming."[1]

*"[পদার্থ বিদ্যার] আইনগুলো মনে হয় অত্যধিক বুদ্ধিমান নকশার ফসল**...** মহাবিশ্বের অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য আছে।"*

"The laws [of physics] ... seem to be the product of exceedingly ingenious design... The universe must have a purpose.**"**[2]

ব্রিটিশ মহাকাশবিদ *জর্জ এলিস* (George Ellis) বলেন,

*"এই জটিলতাকে সম্ভব করেছে যে আইন**,** তাতে বিস্ময়কর উপযুক্ত ভারসাম্য দেখা যায়। যা অর্জিত হয়েছে**,** তার জটিলতাকে স্বীকার করে নেবার পর পৃথিবীর ontological status এর পক্ষ না নিয়েই **"**অতিবাস্তবিক**"** শব্দটি ব্যবহার না করাকেই খুব কষ্টকর মনে হয়।"*

"*Amazing fine tuning occurs in the laws that make this [complexity] possible. Realization of the complexity of what is accomplished makes it very difficult not to use the word 'miraculous' without taking a stand as to the ontological status of the word.***"** [3]

---

[1] The Cosmic Blueprint: New Discoveries in Nature's Creative Ability To Order the Universe. New York: Simon and Schuster, p.203.

[2] Superforce: The Search for a Grand Unified Theory of Nature. (New York: Simon & Schuster, 1984), p. 243.

[3] The Anthropic Principle: Laws and Environments. The Anthropic Principle, F. Bertola and U.Curi, ed. New York, Cambridge University Press, p. 30.

জ্যোতির্বিদ্যাতে Crawford prize বিজয়ী *এলেন স্যান্ডাজ* (Allan Sandage) বলেন,

"আমার মতে এমন সজ্জা কোন এলোমেলো অবস্থা থেকে আসা খুবই অসম্ভব। অবশ্যই কোন পরিচালনার মূলনীতি থাকতে হবে।"

"I find it quite improbable that such order came out of chaos. There has to be some organizing principle."[4]

১৯৮৮ তে নির্মিত BBC science documentary, "The Anthropic Principle" - এ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবজারভেটরির প্রধান *ড. ডেনিস স্ক্যানিয়া* (Dr. Dennis Scania) বলেন,

"আপনি যদি প্রকৃতির নিয়মের সামান্য পরিবর্তন করেন, বা প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলোতে সামান্যতম পরিবর্তন আনেন, যেমন ইলেকট্রনের চার্জ পরিবর্তন করেন, তাহলে সমগ্র মহাবিশ্ব যেভাবে উন্নত হয়, যদি তাতে এমন পরিবর্তন আসে, এটা খুবই অসম্ভব যে বুদ্ধিমান প্রাণী এখানে বেড়ে উঠতে পারে।"

"If you change a little bit the laws of nature, or you change a little bit the constants of nature -- like the charge on the electron -- then the way the universe develops is so changed, it is very likely that intelligent life would not have been able to develop."

একই ডকুমেন্টারিতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Mathematics এর *ড. ডেভিড ডি ডিউশ* (David D deutsch) বলেন,

"আমরা যদি এসব ধ্রুবকের কোন একটিকে কোন এক দিকে কয়েক শতাংশ পরিমাণ ধাক্কা দিই, তারাসমুহ তাদের সৃষ্টির এক মিলিয়ন বছর পরে জ্বলে ওঠে, আর তাতে বিবর্তনের কোন স্থান নেই। আমরা যদি একে কয়েক শতাংশ অন্য দিকে ধাক্কা দিই, তখন হিলিয়ামের চাইতে ভারী কোন কিছু উৎপন্ন হয়না। না কার্বন, না জীবন। এমন কি রসায়নও নয়। একেবারেই কোন জটিলতা হয় না।"

"If we nudge one of these constants just a few percent in one direction, stars burn out within a million years of their formation, and there is no time for evolution. If we nudge it a few percent in the other direction, then no elements heavier than helium form. No carbon, no life. Not even any chemistry. No complexity at all."

[4] Sizing up the Cosmos: An Astronomers Quest. New York Times, p. B9.

- পৃথিবী সৃষ্টিকালের *প্রাথমিক* Entropy[5] বা প্রাথমিক Disorder এর লেভেল সিস্টেম যদি আমরা দেখি, তবে দেখা যায়, এ সময় Thermodynamic disorder ছিল পৃথিবীর সবচে minimum অবস্থায়। অর্থাৎ পৃথিবী এখন যেমন আছে, তেমন অবস্থায় পরিণত হতে এটার Disorder level বা "এলোমেলোভাবে" হবার লেভেল ছিল সবচে কম। যেখানে এমন একটা মহাজাগতিক বিস্ফোরণের পরে Entropy বেশ উচ্চ হবার কথা।

এখন প্রশ্ন হল, পৃথিবী তাহলে কি করে এইরকম গোছানো অবস্থায় এল? যদি আমরা প্রাথমিক entropy এর অবস্থা মাথায় রেখে পৃথিবীর এমন "উপযুক্ত" রূপ নেবার সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তা করি, তবে তা দৈবক্রমে বা নিজে নিজে কাকতালীয়ভাবে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এর বন্ধু, ব্রিটিশ বিজ্ঞানী *রজার প্যানরোজ* (Roger Penrose) এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েছিলেন। তিনি হিসেব কষে দেখলেন, যদি হঠাৎ করে দৈবক্রমে পৃথিবীর এইরূপ উপযুক্ত হবার সম্ভাবনা হবে "10 to the power 10^{123}" বারের মধ্যে ১ বার। "10 to the power 10^{123}" নাম্বারটি কত তা হয়তো বুঝতে কষ্ট হতে পারে। যদি আমরা ১০ এর উপর ১০ টু দি পাওয়ার ১২৩ লিখি, তাহলেই এই নাম্বারটা জানা যাবে। নাম্বারটি দেখতে এমনঃ $10^{10^{123}}$

এই নাম্বারটি সম্পর্কে *রজার প্যানরোজ* বলেন,

"এটি একটি অসাধারণ অংক। কেউ এটা সাধারণ পন্থায় বাস্তবে সম্পূর্ণ লিখতেও পারবেনা। এটি হবে ১ এর পরে পরপর ১০^১২৩ টি ০ (শূণ্য)। যদি মহাবিশ্বের প্রতিটি ভাগে আর প্রতিটি নিউট্রনে আমরা একটি করে ০ (শূণ্য) বসিয়ে লিখতে যাই, আর অন্যসব বস্তু আর কণাকে ভালো পরিমাপের জন্য ফেলে দিই, তবুও আমরা এই অংক লিখতে প্রচুর জায়গার অভাবে পড়ে যাবো।"

"This is an extraordinary figure. One could not possibly even write the number down in full in the ordinary denary notation: it would be 1 followed by 10^{123} successive 0's." Even if we were to write a 0

---

[5] খুব সহজ ভাবে Entropy কে ব্যাখ্যা করতে হলে বলা যায়, কোন একটি সিস্টেমে এলোমেলো অবস্থার মাত্রাকেই Entropy বলে। ধরুন আপনি ৪ টি ভিন্ন রঙ্গের ৪ টি করে মোট ১৬ টি বল নিলেন। ১৬ টি বলকে যদি লাল, নীল, হলুদ আর সবুজ এই ৪ টি লাইনে ৪টি করে করে সাজান, তাহলে এই সাজানোতে Entropy এর level হবে অনেক কম। আর যদি ১৬ টি বলকে একটা বালতিতে নিয়ে ঝাঁকিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন, তাহলে সব বল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে যাবে। এই অবস্থায় Entropy level অনেক বেশি।

on each separate proton and on each separate neutron in the entire universe- and we could throw in all the other particles for good measure- we would fall far short of writing down the figure needed.”[6]

শুরুর প্রশ্নের উত্তরগুলো মনে আছে তো?

উত্তর - ০১: এই মহাবিশ্ব কেউ নিয়ন্ত্রণ করেনি। এটা নিজে নিজে ও দৈবভাবে হয়ে গেছে।

উত্তর - ০২: এই মহাবিশ্বের একজন নিয়ন্ত্রণকারী স্বত্বা আছেন। যিনি পরিকল্পিত উপায়ে এমন উপযুক্ত উপায়ে ভারসাম্যযুক্ত একটি মহাবিশ্বের নকশা করেছেন।

আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনেই যুক্তি আর কমন সেন্স ব্যবহার করি। কেউ যদি আপনার কাছে একটি কুকুর নিয়ে এসে বলে, “দেখো একটা বাঘ ধরে আনলাম।” আপনি কি তা বিশ্বাস করবেন? না। করবেন না। কারণ আপনি যুক্তি এবং কমন সেন্স ব্যবহার করবেন। আপনার যুক্তি বলবে বাঘ দেখতে এমন হয়না বরং কুকুর দেখতে এমন হয়। তাই এটা বাঘ নয়, কুকুর। এমন লক্ষ লক্ষ উদাহরণ আনা যাবে, যেখানে আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতি পদক্ষেপেই যুক্তি, কমন সেন্স আর যৌক্তিক কারণ ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তবে কেন এই বিশাল মহাবিশ্বের নকশার প্রশ্নে তা ব্যবহার করবোনা?

আপনি যদি একমত হন, তবে চলুন, এগোনো যাক।

বলুন তো, উপরি উক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর আলোকে আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দুটির মাঝে যুক্তি, কমন সেন্স আর যৌক্তিক বিচারের মাধ্যমে আমরা কোনটিকে সঠিক বলতে পারি?

আপনি যদি সত্যই লজিক, কমন সেন্স আর তুলনামূলক যুক্তি খাটান, তবে অবশ্যই দ্বিতীয় উত্তর বেছে নেবেন। হ্যাঁ। এই মহাবিশ্বের একজন নিয়ন্ত্রক আছে। একজন নিয়ন্ত্রক ছাড়া এমন সুক্ষ নকশা, বিস্তার আর উপযুক্ত সজ্জা কখনই সম্ভব নয়।

এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন এই উপযুক্ত সজ্জার নকশা দেখেই আপনি মেনে নেবেন একজন নিয়ন্ত্রক বা স্রষ্টা আছে? আসুন তবে একটা ছোট্ট উদাহরণ হয়ে যাক।

---

[6] The Emperor's New Mind, 1989; Michael Denton, Nature's Destiny, The New York: The Free Press, 1998, p. 9.

মোবাইল ফোন আমরা সবাই চিনি। মোবাইল ফোন সাধারণত একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এটি তৈরিতে প্লাস্টিক, তার, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, স্টিল, চুম্বক সহ আরো অনেক কিছুই প্রয়োজন। ধরুন, আপনি এমন একটি গুদামঘরে গেলেন, যেখানে কয়েক কেজি তার, প্লাস্টিক, চুম্বক, বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি, কাচ ইত্যাদি উপকরণ স্তুপ করে রাখা আছে। হঠাৎ আপনি এই স্তুপের ওপরে একটি Latest model এর "iPhone" দেখতে পেলেন। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন এটা কিভাবে এখানে এলো? আমি যদি বলি এই যন্ত্রপাতির স্তুপ আজ বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরেই এখানে আছে। এখানে অনেক চৌম্বকীয় আকর্ষণ বিকর্ষণ হয়েছে, বাতাস প্রবাহিত হয়েছে, ভুমিকম্প হয়েছে, সব যন্ত্রপাতি উথাল পাথাল হয়ে জগাখিচুড়ি হয়েছে, এভাবেই মিক্স আপ হবার ফলে এই "iPhone" টি সৃষ্টি হয়েছে।

আপনি কি আমার কথা মানবেন? না। মানবেন না। কারণ এই উত্তর আপনার যুক্তি, কমন সেন্স আর যৌক্তিক বিচারের সাথে যায়না। এটা অসম্ভব। কেন অসম্ভব? কারণ "iPhone" এর নকশা এত উপযুক্তভাবে করা, দৈব কোন উপায়ে এভাবে তা সৃষ্টি হবার প্রশ্নই ওঠে না। এর নিশ্চই কোন প্রস্তুতকারক আছে, যে এটি বানিয়েছে।

তাহলে এবার আপনি বলুন, যেখানে সামান্য "iPhone" এর নকশা বা ডিজাইনের ক্ষেত্রে দৈব প্রক্রিয়ার দোহাই চলে না, সেখানে সমগ্র মহাবিশ্বের এই *'উপযুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ নকশা'* বা 'Fine Tuned Design' এর ক্ষেত্রে তা কি করে চলতে পারে? কি করে তা হঠাৎ করে হতে পারে? কি করে কোন প্রস্তুতকারক আর নিয়ন্ত্রক ছাড়া এই মহাবিশ্বের এত অদ্ভুত সুন্দর উপযুক্ত নকশা হতে পারে?

আমি জানি আপনার মন এখনো খচখচ করছে। চলুন তাহলে আমরা আরেকটু সামনে এগিয়ে যাই।

Big Bang Theory বা মহাজাগতিক প্রসারণ তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা জানতে পারি এই মহাবিশ্বের একটি শুরু রয়েছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল। এটি কখনই অসীম (infinite) সময় ধরে ছিলনা। কারণ সংখ্যাগত অসীমতার (Numerical infinity) কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। গণিতবিদ *ডেভিড হুভার* (David Hoover) বলেন,

"অসীমতার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই"

"Infinite has no existence in Reality"

প্রায় একই ধরণের কথা *এরিস্টটল* (Aristotle) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

তাই সংখ্যাগত অসীমতাকে আমরা বাস্তব কোন সংখ্যা ধরে কোন কিছু হিসেব করতে পারিনা। আমি যদি বলি একটি ক্লাসে অসীম সংখ্যক এর ছাত্র আছে। এখন যদি সেখান থেকে দুই জন ছাত্র বের হয়ে যায়, তবে কয়জন ছাত্র বাকি রইল? এর কোন বাস্তব সংখ্যাগত উত্তর নেই।

বলতে হবে "*অসীম বিয়োগ দুই*" [Infinity minus 2]। যেটি কোন বুদ্ধিভিত্তিক উত্তর নয়। ঠিক তেমনিভাবে এটিও বলা যুক্তি আর কমন সেন্স এর বাইরে, যে মহাবিশ্ব অসীম বছর ধরে ছিল।

২০০৩ সালে Tufts University এর Institute of Cosmology এর ডিরেক্টার *আলেক্সেন্ডার ভিলিনকেন* (Alexander Vilenkin) আরো দুজন গবেষক *আরভিন বোর্ড* (Arvind Borde) ও *এলেন গুথ* (Alan Guth) মিলে একটি গবেষণা পেপার তৈরি করেন, যেখানে তিনি মহাবিশ্ব অসীম বা Infinite হবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেন। অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেন,

"বলা হয়ে থাকে তর্ক হল যা যুক্তিবাদী মানুষকে বুঝ দিতে পারে আর প্রমাণ হল যা একজন অযুক্তিবাদী মানুষকে বুঝ দিতে পারে। তাই এখন প্রমাণ উপস্থিত হবার পর, কসমোলজিস্টরা আর কখনই 'অসীম মহাবিশ্ব' নামক সম্ভাবনার পিছনে লুকাতে পারবেন না। কোন পালাবার পথ নেই; তাদের অবশ্যই 'মহাজাগতিক শুরু' নামে একটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।"

"It is said that an argument is what convinces reasonable men and a proof is what it takes to convince even an unreasonable man. With the proof now in place, cosmologists can no longer hide behind the possibility of a past-eternal universe. There is no escape; they have to face the problem of a cosmic beginning.**"**[7]

অর্থাৎ মহাবিশ্ব অসীম ছিল - এই যুক্তির পিছে জ্যোতির্বিদদের (Cosmologist) লুকানোর দিন শেষ।

তাহলে এটা সত্য যে এই মহাবিশ্ব বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগে হলেও একটি নির্দিষ্ট সময় পূর্বে জন্ম নিয়েছিল। অর্থাৎ অস্তিত্বে এসেছিল।

অর্থাৎ, মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল।

আসুন আমরা আবার যুক্তি আর কমন সেন্স এ ফিরে যাই। কারণ তত্ত্ব (Theory of causality) এর Cause and Effect বা কারণ ও প্রভাব এর সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি কোন কিছুই কারণ ছাড়া হয়না। যে কোন কিছুই ঘটার বা অস্তিত্বে আসার পেছনে একটি কারণ অবশ্যই আছে। অর্থাৎ Whatever begins to exist, has a cause. অকারণে বা Uncaused উপায়ে কোন কিছুই ঘটেনা। আপনি যদি সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার

[7] Many Worlds in One: Alexander Vilenkin P.176.

বাথরুমে একটি অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙ্গারুকে লাফাতে দেখেন, তবে আপনি অবশ্যই এই ক্যাঙ্গারু এখানে উপস্থিত হবার সাম্ভাব্য সমস্ত কারণ অনুসন্ধান করবেন। আপনি এটা কখনই মেনে নেবেন না, যে এটা অস্বাভাবিক নয় অথবা এই রকম কোন কারণ ছাড়াই কোন ক্যাঙ্গারু বাথরুমে আসতেই পারে। এইজন্যেই স্কটিশ দার্শনিক *ডেভিড হিউম* (David Hume) বলেন,

"আমি কখনই এই অদ্ভুত যুক্তিতে সায় দিই নি, যে কোন কিছু কোন কারণ ছাড়াই অস্তিত্বে আসতে পারে।"

"*I never asserted to absurd proposition that anything might arise without cause.****"*** [8]

তাহলে আমরা যদি যুক্তি, যৌক্তিক বিচার আর কমন সেন্স খাটাই, তাহলে দেখতে পাই মহাবিশ্বের অস্তিত্বে আসাকে আমরা এমনি এমনিই হয়েছে বা অকারণেই হয়েছে বলে উড়িয়ে দিতে পারিনা। অন্তত কারণ ও প্রভাব আইন এবং আমাদের কমন সেন্স আমাদের সে সিদ্ধান্তে আসতে দেয়না। তাই যৌক্তিকভাবে আমরা বলতে পারি এই মহাবিশ্ব এক সময় শুরু হয়েছিল এবং এর নিশ্চই কোন কারণ ছিল।

[8] Personal Letter, David Hume to John Stewart (1754)

কেন শুরু হয়েছিল?

Big Bang Theory বা মহাজাগতিক প্রসারণ শুধু কিভাবে Big Bang এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের শুরু হয়, সেটাই ব্যাখ্যা করে। তবে কেন এই Big Bang ঘটলো তা আমাদের সরাসরি জানায় না। এইভাবে আরো কিছু প্রশ্ন চলে আসে। যেমন, কিভাবে মহাবিশ্বের এত সুক্ষ্ম সম্প্রসারণ হল, মহাবিশ্বের নকশা এত উপযুক্ত কি করে হল, কেন সব কিছু এত ভারসাম্যময় হল ইত্যাদি।

বিজ্ঞানি স্টিফেন হকিনস তার *'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'* গ্রন্থের "মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, আদি মহাবিশ্বের চরমভাবে উত্তপ্ত হওয়া, মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের সূক্ষ্ম নীতি, বৃহৎমানে মহাবিশ্বের সমরূপ ও সমসত্বসম্পন্ন হওয়া ইত্যাদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উত্তর পাওয়া যায়না। তিনি বলেন, স্রষ্টা এর উত্তর হতে পারে। তবে শুরুতে ব্যাখ্যা- অযোগ্য সৃষ্টি ও এরপর ব্যাখ্যাযোগ্য বিস্তার – মহাবিশ্বের এই রহস্যময় দুটি স্তরের অস্তিত্বের কারণে তিনি স্রষ্টাকে মানতে ব্যক্তিগতভাবে রাজি হননি। যদিও এই কারণে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে দেয়ার কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই।

আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাবিশ্বের শুরু হবার পিছনে অবশ্যই কোন কারণ ছিল। কেননা উপরি উক্ত প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর পাওয়া না যাবার ফলে যদি বলা হয় এই মহাবিশ্ব কিছু থেকেই আসেনি, নিজে নিজেই হয়েছে, তবে সেটা হবে অত্যন্ত অযৌক্তিক ও কমন সেন্স এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আগে যে ক্যাঙ্গারুর উদাহরণ এনেছিলাম, সেটা আবার বিবেচনা করা যাক। আমরা কি বলতে পারি সেই ক্যাঙ্গারুটি "নাই" থেকেই "আছে" হয়ে গেল? আমরা কি বলতে পারি এটা কোন কিছু থেকেই আসেনি, এটা নিজে নিজেই এই বাথরুমে হঠাৎ এসে পড়েছে। ম্যাজিক-শো তে যেভাবে হাওয়া থেকে বল, লাঠি, খরগোশ নিয়ে আসার মায়াজাল দেখানো হয়, ঠিক তেমনি।

নাহ। আমরা তা বলতে পারিনা। এটা সম্পূর্ণ ভুল বিচার। তাই "*নাই*" থেকে কোন কিছু "*আছে*" হয়ে যেতে পারেনা। অর্থাৎ কোন কিছু থেকেই মহাবিশ্ব আসেনি বা এটি নিজে নিজেই হয়েছে, সেটা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। একটি সামান্য ক্যাঙ্গারুর বেলায় আমরা যেটি মেনে নিতে পারিনা, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বেলায় তা মেনে নেয়া হাস্যকর।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ও একসময়কার বিখ্যাত "*নাস্তিক*" *এন্টনি ফ্লিউ* (Antony Flew) তার There is a God (How the world's most notorious atheist changed his mind) বইতে যুক্তিতর্কের সাহায্যে উল্লেখ করেন,

"হয় মহাবিশ্ব কারণহীন, নয়তো মহাবিশ্বের কারণটাই কারণহীন"

"Either the universe is uncaused or the cause of the universe is uncaused"

আমরা এখন প্রমাণসহ দেখতে পাচ্ছি এই মহাবিশ্ব কারণহীন নয়। যা কিছুই অস্তিত্বে আসে, বা জন্ম নেয় বা সৃষ্ট হয়, তা অবশ্যই কেউ শুরু করেছেন অথবা সৃষ্টি করেছেন।

তাই যৌক্তিকতার মানদন্ডে উন্নীত হতে পারে শুধুমাত্র একটি উত্তর। সেটি হল এই মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে। অর্থাৎ এটির সৃষ্টি হয়েছে। কোন এক স্বত্বা যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন, তিনিই এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি করেছেন।

খেয়াল করে দেখুন তো, আমরা কোন অন্ধ বিশ্বাসের জোরে প্রমাণ ছাড়াই খেয়াল খুশি মত এই কথা বলছি কিনা? নাহ। আমরা এতক্ষণ যুক্তি, যৌক্তিক বিচার এবং কমন সেন্স এর প্রয়োগের মাধ্যমেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

তারপরেও আপনার মন হয়তো এদিক ওদিক করছে। আপনি হয়তো মনে মনে বলছেন, যদি স্রষ্টা থেকেই থাকে, তবে তাকে কে সৃষ্টি করলো?

বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আছে। এটা মেনে নেবার পরেও কিন্তু শুধুমাত্র তর্কের খাতিরেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন আসে, যে এই স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করলো। চলুন আমরা দেখি এই প্রশ্নের যৌক্তিক ভিত্তি কতটুকু?

Big Bang Theory বা মহাজাগতিক প্রসারণ তত্ত্ব অনুসারে Big Bang এর মাধ্যমেই সময়, পদার্থ বা Matter, শক্তি এবং স্থান তৈরি হয়। এর আগে এই চারটি বিষয়ের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। তাই আমরা যখন কোন বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তখন আমরা এই চারটি বিষয়ের আলোকেই বা এই চারটি বিষয়ের গন্ডিতেই প্রশ্ন করি। কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্ব যখন সময়, পদার্থ, শক্তি এবং স্থান এর গন্ডির বাইরে, তখন আমরা একই ধরণের প্রশ্ন স্রষ্টার ক্ষেত্রে করতে পারিনা। কেননা আমাদের প্রশ্ন তখন এমন কিছুর ভিত্তিতে হবে, যা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। সময়, পদার্থ, শক্তি এবং স্থান - এর সীমার বাইরের কিছু সম্পর্কে সময়, পদার্থ, শক্তি এবং স্থান - এর সীমাবদ্ধ কোন বিষয়ের অনুরূপ প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। প্রশ্নটা অনেকটা এমন, যে মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, মেমোরি চিপ আর ব্লুটুথ আবিষ্কার হবার পূর্বে মানুষ ব্লু টুথ দিয়ে মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ডে ছবি কি করে নিত? অথচ মানুষ তখন এই তিনটির গন্ডির বাইরে। তাই এই প্রশ্নই অবান্তর।

এন্টনি ফ্লিউ যেমনটা বলেছিলেন হয় এ মহাবিশ্ব কারণহীন/ স্রষ্টাহীন, নয়ত এই বিশ্বের স্রষ্টা কারণহীন/ স্রষ্টাহীন। তাই আমরা স্পষ্ট দেখতে পারছি এই মহাবিশ্ব হল স্রষ্টার সৃষ্ট। তাই স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করলো, এই প্রশ্ন দার্শনিকভাবেও অযৌক্তিক।

আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় গীতাঞ্জলি কে লিখেছেন? আপনি বলবেন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় রবীন্দ্রনাথকে কে লিখেছেন? তখন আপনি বলবেন এ প্রশ্নে

ব্যকরণগত ত্রুটি আছে এবং এটা অযৌক্তিক প্রশ্ন। এ ধরণের প্রশ্নই হতে পারেনা। কেননা স্রষ্টা তার সৃষ্টি থেকে বৈশিষ্ট্যগত ভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, মোনালিসা কে এঁকেছেন? আপনি বলবেন লিওনার্দো ড্যা ভিঞ্চী। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় লিওনার্দো ড্যা ভিঞ্চীকে কে এঁকেছেন? এখনও আপনি বলবেন এ প্রশ্নে ব্যকরণগত ত্রুটি আছে এবং এটা অযৌক্তিক প্রশ্ন। এ ধরণের প্রশ্নই হতে পারেনা। কেননা স্রষ্টা তার সৃষ্টি থেকে বৈশিষ্ট্যগত ভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন? এ প্রশ্নে ব্যকরণগত ত্রুটি আছে এবং এটা অযৌক্তিক প্রশ্ন। এ ধরণের প্রশ্নই হতে পারেনা। কেননা স্রষ্টা তার সৃষ্টি থেকে বৈশিষ্ট্যগত ভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

চলুন আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করি। ধরি '১- ২- ৩- ৪' এগুলো বিভিন্ন বস্তু। আমি প্রশ্ন করলাম '১' কে সৃষ্টি করেছে? উত্তর হোল '২' সৃষ্টি করেছে। '২' কে কে সৃষ্টি করেছে? উত্তর হল '৩' সৃষ্টি করেছে। '৩' কে কে সৃষ্টি করেছে? উত্তর হল '৪'। এভাবে যদি আমরা প্রশ্ন করতেই থাকি তাহলে আমাদের প্রশ্ন কোনদিনই শেষ হবেনা। আমাদের প্রশ্ন সংখ্য হবে অসীম বা Infinite. কিন্তু আমরা আগেই জেনেছি সংখ্যাগত অসীমতার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। ফলে ১ এর অস্তিত্বে আসাটাই সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অথচ তা কি করে সম্ভব? ১ তো ইতোমধ্যে বাস্তবে অস্তিত্বে আছেই!

তেমনি ভাবে যদি প্রশ্ন করি মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে বলা হবে স্রষ্টা। তারপর প্রশ্ন হবে স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছে? বলা হবে তার স্রষ্টা। এরপর প্রশ্ন হবে তার স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছে? বলা হবে তারও স্রষ্টা। এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্নই আসতে হবে। কোনদিন শেষ হবেনা। অর্থাৎ অসীম বা Infinite সংখ্যার প্রশ্ন হবে। ফলে মহাবিশ্বের অস্তিত্বে আসাটাই সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে অসম্ভব হয়ে যাবে যা অসম্ভব, কারণ মহাবিশ্ব তো অস্তিত্বে আছেই!

তাহলে দেখতে পাচ্ছি কোন না কোন স্থানে আমাদের থামতেই হবে। এবং সেই স্থানটি হবে এমন একটি স্থান, যেখানে এমন এক স্বত্বার অবস্থান হবে যা অসৃষ্ট। যার আর কোন স্রষ্টা থাকবেনা। থাকতে পারেনা। না বৈজ্ঞানিকভাবে, না যৌক্তিকভাবে, না দার্শনিকভাবে।

আর সেই স্থানটিই হল মহাবিশ্বের স্রষ্টা। কারণ একমাত্র এই স্বত্বাই সময়, পদার্থ, শক্তি এবং স্থান এর সীমাবদ্ধতার বাইরে। ফলে আমাদের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যৌক্তিক বিচারের সীমারেখার মধ্যে সময়, পদার্থ, শক্তি এবং স্থান এর গন্ডিতে এই স্বত্বা কিভাবে অস্তিত্বে এল, সেই প্রশ্ন করা অসম্ভব, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক।

সুতরাং কোনরূপ পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যাতিত আমরা যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতার এর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসলাম যে এই মহাবিশ্ব নিজ থেকে সৃষ্টি হয়নি বা অস্তিত্বে আসেনি। কোন অতিশক্তিশালী, অতিপরাক্রমশালী স্বত্বার অস্তিত্ব রয়েছে, যা এই মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছে। অর্থাৎ সৃষ্টি করেছে। যৌক্তিক ভাবেই হোক, আর ব্যকরণগত ভাবেই হোক, তাকে আমরা স্রষ্টা হিসেবেই চিহ্নিত করতে পারি।

অর্থাৎ, একজন স্রষ্টা আছেন। যিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা। যিনি কেমন, তা আমরা জানিনা। কেননা যিনি সময়, পদার্থ, শক্তি এবং স্থান এর সীমাবদ্ধতার বাইরে, তাকে আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সময়, পদার্থ শক্তি এবং স্থান দিয়ে বিচার করে তার স্বরূপ নিরুপণ করা যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক কষ্ঠিপাথরের নিরিখে অসম্ভব। তাই স্রষ্টা দেখতে কেমন, সেই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর পাওয়া অসম্ভব।

তাই আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যে একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন, যার স্বরূপ জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মানলাম স্রষ্টা আছে। কিন্তু ...

এখন আপনি বলতে পারেন যে মানলাম স্রষ্টা আছে। কিন্তু পৃথিবীতে এতগুলো ধর্ম! সবাই বলে তাদের স্রষ্টাই আসল স্রষ্টা। তাদের ধর্মই আসল ধর্ম। তাহলে কোনটা সত্য? কোন ধর্মটা সত্য? কোনটি স্রষ্টা থেকে আগত?

আসুন আমরা একটা একটা করে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। তার আগে আমরা কিছু প্রশ্ন তৈরি করে ফেলি যা আমাদের সত্য অনুসন্ধানে সাহয্য করবে।

০১. স্রষ্টা কেন সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ করবেন?
০২. এতগুলো ধর্ম কেন? সবাই কেন দাবি করছে তার ধর্ম স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত?
০৩. সব ধর্ম কি একই সাথে সঠিক হতে পারে?

০১. স্রষ্টা কেন সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ করবেন?

ছোট্ট একটা উদাহরণের মাধ্যমেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ধরুন একজন বিজ্ঞানী এমন একটি নতুন যন্ত্র তৈরি করলেন, যা আজ অব্দি কেউ কখনো দেখেনি, শোনেনি, কোন পরিচয় নেই। তো এই যন্ত্র তৈরি করে কোনরূপ ক্যাটালগ ছাড়াই বিজ্ঞানী যদি সেটা বাজারে ছেড়ে দেন, তাহলে সেই যন্ত্র নিয়ে যেমন ব্যবহারকারীরা বিপদে পড়বেন, তেমনি সঠিক ব্যবহারের অভাবে যন্ত্রটিও নষ্ট হয়ে পড়বে।

এটা অত্যন্ত হাস্যকর ও অযৌক্তিক যে, কোন বিজ্ঞানী একটা প্রসেসর তৈরি করবেন, সেই প্রসেসর কে সাপোর্ট দেবার জন্যে মাদারবোর্ড তৈরি করবেন, পুরো সিস্টেমকে চালানোর জন্য মাউস, মনিটর, কী বোর্ড তৈরি করবেন – অথচ এই পুরো সিস্টেমটা কি করে চালাতে হবে, কিভাবে চলবে, কোন পদ্ধতিতে চালানো হবে, সেই ব্যাপারে কোন দিকনির্দেশনা দেবেন না।

তাহলে যখন আমরা এই যুক্তিটা সামান্য একটা যন্ত্রের ক্ষেত্রে মেনে নিতে পারছিনা, সেখানে সমগ্র মহাবিশ্বের ও সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির ব্যাপারে কি করে মেনে নেয়া যায়? ব্যাপারটা এমন, যে আমরা এক গ্লাস স্যালাইনকে লবনাক্ত মেনে নিচ্ছি, কিন্তু সুবিশাল সমুদ্রকে লবনাক্ত মেনে নিতে চাইছিনা।

তাই এটা অত্যন্ত যৌক্তিক যে স্রষ্টা যখন এই মহাবিশ্ব ও তার বুকে প্রাণের সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবধারিত ভাবেই তার সৃষ্টিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্যে দিকনির্দেশনা দেবেন। তাই এই দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্যেই তিনি যোগাযোগ করবেন সৃষ্টির সাথে।

০২. এতগুলো ধর্ম কেন? সবাই কেন দাবি করছে তার ধর্ম স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত?

সুপ্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ স্রষ্টাকে জানার চেষ্টা করেছে। আমরা হয়তো আজকে এই বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের যুগে অনেক যৌক্তিক বিচার ও যুক্তি খাটিয়ে স্রষ্টাকে জানার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেই আদিকাল থেকেই মানুষের মাঝে জন্মগত স্রষ্টার অস্তিত্বের অনুভূতি বিরাজমান ছিল। ইতিহাসে চোখ পাতলেই বোঝা যায় মানুষ স্রষ্টার সন্ধানে কিরূপ নিমজ্জিত ছিল। কখনো আকাশ তো কখনো বাতাস, কখনো সূর্য তো কখনো চন্দ্র, কখন পশুপাখি তো কখনো গাছপালা – সব কিছুকেই মানুষ স্রষ্টা বলে ভেবে নিয়েছিল। এভাবে তারা স্রষ্টার আরাধনা করতো। উপাসনা করতো। তারা বিশ্বাস করতো এইসব প্রাত্যহিক জীবনের অংশবিশেষ যেমন, গাছ-পালা সূর্য – এসব স্রষ্টার রূপ। এই স্রষ্টাই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাই তাকে ভক্তি করা আবশ্যক। এই চিন্তাধারা থেকেই তাদের উপাসনার ধারণা জন্মায়। এভাবে মানব সমাজের পরতে পরতে আমরা দেখতে পাই অনুসন্ধিৎসু মানুষের স্রষ্টার সন্ধানের চমকপ্রদ সব গল্পকথা।

এভাবেই মূলত বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সমাজ গড়ে ওঠে। কোন নির্দিষ্ট সামাজিক এলাকাতে তাদের সকলের ধর্মীয় বিশ্বাসটা প্রাধান্য পেয়ে একটা ধর্মীয় সমাজ সৃষ্টি হত। এভাবে সূচনা হত একটা ধর্মের।

তবে সব ধর্মের সূচনা এক রকম নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বেশিরভাগ ধর্মই সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র আইডিয়া এবং ধারণার ভিত্তিতে। অল্প কিছু ধর্মই আছে যারা দাবি করে তাদের কাছে ঐশী বাণী রয়েছে। যেহেতু শুধুমাত্র ধারণার ভিত্তিতে সূচিত ধর্মের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই, তাই ঐসব ধর্ম নিতান্তই দর্শন। আমরা শুরু থেকে যেভাবে যুক্তি আর কমন সেন্স এর মাধ্যমে এগিয়েছি, সেখানে নিতান্ত দর্শনের কোন স্থান নেই। তাই আমরা আলোচনা করবো শুধুমাত্র ঐসব ধর্ম নিয়ে, যারা দাবি করে স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাদের কাছে বার্তা এসেছে।

সেক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে *ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম* এবং *ইসলাম ধর্ম।*

কম বেশি উপরোক্ত সব ধর্মেই দাবি করা হয় যে তাদের যে ধর্মীয় গ্রন্থ, সেটি স্রষ্টা প্রদত্ত। তাই আমরা এখন এইসব ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর ব্যাপারে যৌক্তিক পর্যালোচনা করে দেখবো, যে গ্রন্থ গুলো আদৌ স্রষ্টা প্রদত্ত হতে পারে কিনা।

এই পর্যালোচনার পর আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন, অর্থাৎ সব ধর্মই একই সাথে সঠিক, সেটা হতে পারে কিনা তা আমরা জেনে যাবো।

পর্যালোচনার শুরুতে আমরা কিছু মানদন্ড নির্বাচন করবো, যার দ্বারা আমরা এইসব ধর্মগ্রন্থ পরীক্ষা করে দেখতে পারি। মানদন্ড গুলো হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, যৌক্তিক ও অর্থবহ।

মানদন্ড - ০১

ধর্মগ্রন্থ সম্পূর্ণ রূপে ঐশী হতে হবে। এক লাইন, এক শব্দও মানুষের লেখা হতে পারবেনা। এক গ্লাস দুধে এক ফোঁটা বিষ পুরো গ্লাসের দুধকে পান অযোগ্য করে দেয়। কোন ধর্মগ্রন্থে একটা শব্দও মানুষের লেখা যোগ করা হয়েছে, এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে তা পুরো ধর্মগ্রন্থকেই বাতিল করে দেয়, কেননা এটা আমাদের পক্ষে বিচার করা অসম্ভব যে এর কোন অংশ ঐশী, কোন অংশ মানবরচিত। এখানে প্রাথমিকভাবে নিরীক্ষার জন্যে ধরে নেয়া হচ্ছে ধর্মগ্রন্থগুলো আসলেই ঐশী।

মানদন্ড - ০২

ধর্মগ্রন্থে কোন রকম বিয়োজন করা যাবেনা। ধর্মগ্রন্থের সম্পূর্ণ ইতিহাসে কখনো যদি একটা শব্দও বাদ দেয়া হয় তবে সেই ধর্মগ্রন্থের বিশ্বাসযোগ্যতা আর থাকবেনা। পরে যদি সেটা যোগও করা হয়, সেটা আর বিশ্বাসযোগ্যতা পেতে পারেনা।

মানদন্ড - ০৩

স্রষ্টার সংখ্যা সংক্রান্ত কোনরূপ দ্বিমুখীতা কিংবা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাবেনা। ধর্মগ্রন্থ এর শুরু থেকে শেষ অব্দি স্রষ্টার সঙ্খ্যা যেটাই বলা হোকনা কেন, তা একই থাকবে।

মানদন্ড ০৪

সবশেষে ধর্মগ্রন্থে এককভাবেই স্রষ্টার একত্ববাদের উল্লেখ থাকতে হবে। একত্ববাদ কেন থাকতে হবে সে বিষয়ে আমরা শুরুতে আলোচনা করবো।

কেন স্রষ্টা একজনই হতে হবে?

আমরা শুরু থেকেই কোনরূপ পক্ষপাতিত্বে না গিয়ে নিরপেক্ষভাবে স্রষ্টার স্বরূপ সন্ধানে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এগিয়েছি। সেই যৌক্তিকতার ফলেই আমরা বলতে পারি এই মহাক্ষমতাধর স্রষ্টা একজনই। এর পেছনের কারণঃ

কারণ ১. মহাবিশ্ব সৃষ্টির দুইটি সর্বশক্তিমান কারণ (ALL POWERFULL CAUSE) থাকতে পারেনা। কারণ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে শুধুমাত্র একটি সর্বশক্তিমান কারণ থাকবে। কারণ সর্বশক্তিমান কারণ একটিই লাগে। তা দুইটি হওয়া অযৌক্তিক। আমরা যৌক্তিকভাবে স্রষ্টাকে সার্বভৌম (Omnipotent) বলে সিদ্ধান্তে এসেছি। এখন সার্বভৌম শক্তি কখনই এক হওয়া ছাড়া একাধিক হতে পারেনা। কারণ সংজ্ঞাগত দিক থেকে সার্বভৌম মানে হল যে অসীম ক্ষমতা রাখে (The one who possesses infinite power) অথবা অথবা অসীম ক্ষমতাধর (Having unlimited power)। এখন প্রশ্ন হল যদি একের অধিক সার্বভৌম সত্ত্বা থেকে থাকে যাদের দুইজনেরই শক্তি আক্ষরিক অর্থেই অসীম, তাহলে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করতে সক্ষম। কারণ একই সাথে দুইজন সার্বভৌম স্বত্বা অস্তিত্বে থাকাটা অসম্ভব। একের অধিক হলেই সার্বভৌমত্ব বিলীন হতে বাধ্য। দুইজন সার্বভৌম সত্ত্বা সংজ্ঞাগত ভাবেই একজন আরেকজনের শক্তিকে দমন করতে সক্ষম। কিন্তু সেই একই সংজ্ঞার অধীনে এটা অসম্ভব কেননা অপরজনও অসীম শক্তির অধিকারি যাকে ধ্বংস করা কিংবা যার শক্তিকে দমিয়ে রাখা অসম্ভব। তাই বোঝাই যাচ্ছে একই সাথে দুইটি সার্বভৌম স্বত্বার অস্তিত্ব যৌক্তিকতার মানদন্ডে অসম্ভব। অযৌক্তিক। আমরা আগেই জেনেছি স্রষ্টা তার সৃষ্টির মত হওয়া অসম্ভব। তাই সৃষ্টির মধ্যে যেমন আমরা দেখি একই সাথে দুজন প্রথম স্থান অধিকার করে, সেই যুক্তি স্রষ্টার ক্ষেত্রে খাটেনা। তাছাড়া সৃষ্টি কখনই সার্বভৌম হতে পারেনা। ফলে সীমিত শক্তির বিচারে একই সাথে দুজন "শ্রেষ্ঠ" হওয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্ভব। স্রষ্টার ক্ষেত্রে নয়। তাছাড়া যদি দুইজন স্রষ্টা থাকে, তাহলে তাদের অবশ্যই শক্তি ভাগ হবে। যা শেষমেষ স্রষ্টার সার্বভৌম বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ও অযৌক্তিক।

কারণ ২. স্রষ্টার একাধিক সত্ত্বা থাকার আরেকটি মতবাদ হল Incarnation বা অবতারবাদ। সোজা বাংলায় স্রষ্টা সৃষ্টির রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসবেন। এই মতবাদ শুরুতেই শেষ। সংজ্ঞাগতভাবে স্রষ্টা সৃষ্টি থেকে আলাদা হতে বাধ্য। স্রষ্টা সৃষ্টির রূপ নিলে তার স্রষ্টা হিসেবে যেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য, তা সৃষ্টিতেই বিলীন হয়ে যায়। আমরা শুরুতেই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সংক্রান্ত আলোচনায় এই স্পষ্ট সিদ্ধান্তে এসেছি যে স্রষ্টা এমন একটি মহাপরাক্রমশালী সত্ত্বা, যার শক্তি অপরিসীম, যার ক্ষমতা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার ক্ষমতার বাইরে। তিনি সার্বভৌম। The All powerful, The unlimited powerful entity. যদি সেটাই হয়, তবে সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে কিংবা তাদের সমস্যা বুঝতে বা সমাধান করতে অথবা তার সার্বভৌমত্ব, পরাক্রমশালীতা, ক্ষমতা সম্পর্কে সৃষ্টিকে ধারণা দিতে তার সৃষ্টির রূপ ধারণ করা অযৌক্তিক। স্রষ্টা যদি সার্বভৌমই হন, তবে তিনি এমন কিছুই করতে পারেন না, যেটা তার সার্বভৌম স্বত্বাকে হালকা করে দেয়। Incarnation বা অবতারবাদ তেমনই একটা

ধারণা। অবতারবাদের ফলে এটা বলাই যায়। তাই *‘স্রষ্টা কখনই সৃষ্টির মত হতে পারেনা’* - এই সত্যের সাথে অবতারবাদ সাংঘর্ষিক।

কারণ ৩. কোন কোন ধর্মে এটাও দাবি করা হয় যে সব স্রষ্টা বা “god” একই শক্তিধারী নন। একেকজনের শক্তি একেক রকম। কারো বেশি কারো কম। কারো শক্তি আগুনের, কারো বাতাসের, কারো ভালোবাসার, কারো ঘৃণার ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হল, যদি স্রষ্টা আসলেই এতজন হয়ে থাকেন, তাহলে একজন সৃষ্টির কোন প্রয়োজনই পড়েনা একাধিক স্রষ্টাকে উপাসনা করার। সে সরাসরি সেই স্রষ্টাকেই উপাসনা করবে যার ক্ষমতা ও শক্তি সবচে বেশি। যে অন্যদের চাইতে বেশি শক্তিধর। ব্যাস। তার তো প্রয়োজন নেই “কম শক্তিধর ও কম ক্ষমতাধর” স্রষ্টাকে খুশি করার, কারণ সে “আসল সর্বোচ্চ শক্তিধরকেই” খুশি করছে।

আবার যদি এটা বলা হয় একেক “god” একেক বিষয়ের god, তাহলেও ঘুরে ফিরে কথা আমাদের প্রথম যুক্তিতেই চলে আসছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টা, কিন্তু সবার ক্ষমতাই সমান। আবার সেই দ্বৈত সার্বভৌমতার প্রশ্ন, যা আমরা আগেই অসম্ভব প্রমাণ করেছি।

এখন আমাদের কাছে মানদন্ড উপস্থিত। আসুন আমরা প্রচলিত ধর্মগুলো বিশ্লেষণ করে দেখি।

- **ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্ম**

ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্মকে একসাথে আলোচনা করার কারণ বর্তমানে তাদের ধর্মগ্রন্থ একই। ইহুদীরা বিশ্বাস করে তাদের কাছে স্রষ্টা তার ঐশী বই ‘আদি পুস্তক’ বা Old Testament পাঠিয়েছেন। আর খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে তাদের কাছে স্রষ্টা তার ঐশী বই *‘নব পুস্তক’* বা New Testament পাঠিয়েছেন। বর্তমানে এই দুটো বই আলাদা অবস্থায় নেই বরং এক করে ফেলা হয়েছে। আর এই সংযুক্ত সংস্করণের নাম হল Bible বা *বাইবেল*। আসুন আমাদের মানদন্ডের নিচে বাইবেলকে রাখি।

আমাদের প্রথম দুটি মানদন্ড ছিল ধর্মগ্রন্থে কোনরূপ সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবেনা। কিন্তু বাইবেলের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই অসংখ্যবার এটি মানুষ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। তাছাড়া এটির কোন নির্দিষ্ট মৌলিক গ্রন্থও নেই। বিভিন্ন ভার্সন এ বাইবেল বিভক্ত। অসংখ্য উদাহরণের একটি উদাহরণ হল -

বাইবেলের Revised Standard version 1952 তে Gospel of Mark এর Chapter 16 এর 9-20 পর্যন্ত Verse নেই, যেগুলো King James Version এ আছে। Revised Standard Version 1952 তে এই Verse গুলো নিচে ফুটনোট দিয়ে রাখা

হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সবার আপত্তিতে 1952 এর পরের ভার্সন গুলাতে আবার Verse গুলো Restore বা পুনরায় যোগ করা হয়।

আরেকটি উদাহরণ হল, বাইবেলের Roman catholic bible: Douay version এ মোট ৭৩ টি বই রয়েছে। কিন্তু King James Version এ রয়েছে শুধুমাত্র ৬৬ টা। যা Roman catholic bible: Douay version এর চাইতে ৭ টা বই কম। অনেক খৃষ্টান দাবি করেন এগুলো Spurious বা নকল বই। মানে দেখতে সত্যি, কিন্তু সত্যি না।

একজন বাইবেলবিদ, *মিসেস এলেন জি হোয়াইট* (Mrs. Ellen G. White), যিনি Seventh Day Adventist Church এর একজন Prophetess, তিনি তার Bible Commentary এর ১ম খন্ডের ১৪ তম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন –

"যে বাইবেলটি আমরা বর্তমানে পড়ি, তা অসংখ্য নকলকারকের কর্ম, যারা অসাধারণ যথাযথ উপায়ে নকলের কাজটি করেছেন। কিন্তু নকলকারকরা ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন না। আর ঈশ্বর স্পষ্টতই এসবকে (ঐশী বাণী) একত্রে লিখে রাখার ক্ষেত্রে ভুলের উর্ধ্বে বিবেচনা করেন নি।"

"The Bible we read today is the work of many copyists who have in most instances done their work with marvelous accuracy. But copyists have not been infallible, ad GOD most evidently has not seen fit to preserve them altogethaer from error in transcribing."

পরবর্তী পাতাগুলোতে তিনি লিখেছেন,

"আমি দেখেছি ঈশ্বর বিশেষভাবে এই বাইবেলকে সংরক্ষণ করেছিলেন, তারপরেও যখন এর খুব কম সংখ্যক কপি ছিল, তখন জ্ঞানী ব্যক্তিরা কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দসমূহ পরিবর্তন করেছেন, এটা ভেবে যে তারা এটিকে সরলিকরণ করছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শ অনুযায়ী, যে মতাদর্শ ঐতিহ্য দ্বারা লালিত, এটিকে পরিবর্তন করতে গিয়ে সরল জিনিসটাকেই জটিল ও ধাঁধাঁযুক্ত করে ফেলেছেন।"

"I saw that GOD had especially guarded the Bible, yet when copies of it were few, learned men had in some instances changed the words, thinking that they were making it plain, when in reality they were mystifying that which was plain, by causing it to lean to their established views, which were governed by tradition.**"**

এখন একই বই, যেটা স্রষ্টা থেকে আগত, সেটার কিছু verse এক version এ থাকবে তো আরেক version এ থাকবেনা, এক version এ একটা chapter থাকবে তো

আরেক version এ থাকবে না, এই ব্যাপারগুলো স্পষ্টই প্রমাণ বহন করে যে বাইবেল মানুষের হাতে এলোমেলো হয়েছে। সবচে বড় কথা, বাইবেলের আদি থেকে আজ অব্দি মোট প্রায় ২৪০০০ version রয়েছে। version মানে অনুবাদ নয়। আক্ষরিক অর্থেই version. কারণ উপরের উদাহরণ গুলোর মতই বিভিন্ন version এ অসংখ্য গোঁজামিল লক্ষ্যণীয়।

আমাদের প্রথম দুটি শর্ত ছিল যে ধর্মগ্রন্থে একটি শব্দও মানুষের লেখা হবেনা এবং একটি শব্দও বিয়োগ দেয়া হবেনা। কিন্তু বাইবেল সেই মানদন্ডে কোনভাবেই উত্তীর্ণ হতে পারেনা।

এছাড়া আমাদের শেষ দুটি মানদন্ডেও বাইবেল উত্তীর্ণ হয়না, কেননা সেখানে স্রষ্টার সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট পরস্পরবিরোধিতা রয়েছে। বাইবেলের বিভিন্ন Version এ, এমনকি একই Version এর বিভিন্ন স্থানে রয়েছে স্রষ্টার সংখ্যা নিয়ে দৃষ্টিকটু পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। যেমন,

“তাই তোমরা যাও**,** তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। *পিতা***,** *পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে* বাপ্তিস্ম দাও” [*মথী ২৮:১৯***]**

“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit” [Matthew 28:19]

এখানে বলা হচ্ছে trinity এর কথা। অর্থাৎ স্রষ্টা হল তিনজনের সমষ্টি। তিনজন বিলীন হয়েছে এক সত্ত্বায়। স্রষ্টা, যীশু আর Holy Spirit বা পবিত্র আত্মা। অর্থাৎ আমরা এখানে তিনজন God বা God এর অংশ পাচ্ছি। আবার,

*“আমি ও পিতা***,** *আমরা এক।” [যোহন ১০:৩০]*

“He (Jesus) later added, I and the Father are one**”** [Gospel of John 10:30]

এখানে দেখছি যীশু বলছেন, তিনি আর God একজন। অর্থাৎ হয় যীশুই God, নয়তো যীশু ও God মিলে এক সত্ত্বা।

আবার,

*“ইসরাইলের লোকরা শোনো***!** *প্রভু***,** *আমাদের ঈশ্বর হলেন একমাত্র প্রভু***!***” [দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪]*

“Hear, O Israel: The LORD our GOD is one LORD” [Deuteronomy 6:4]

“তোমরা শুনেছ যে, আমি তোমাদের বলেছি যে আমি যাচ্ছি আর আমি আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা যদি আমায় ভালবাস তবে এটা জেনে খুশী হবে য়ে আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, কারণ পিতা আমার থেকে মহান” [যোহন ১৪:২৮]

“You heard me say, 'I am going away and I am coming back to you.' If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the *Father is greater than I*.” [Gospel of John 14:28]

এখানে দেখা যাচ্ছে যীশু একবার বলেছেন God একজনই। সাথে আরো দেখা যাচ্ছে তিনি সেই God কে তার চাইতেও অধিক শক্তিশালী, ক্ষমতাধর বা মহান বলছেন।

বাইবেলের তিনটি স্থানে God সম্পর্কে তিনরকম তথ্য সত্যিই এ প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে এটা আদৌ স্রষ্টার বাণী হতে পারে কিনা।

এ ছাড়াও শুরুতে যে Trinity এর কথা বলা হয়েছে, তার উল্লেখ কিছুমাত্র বাইবেল ভার্সনে আছে। কিছুতে নেই। যেমন King James version এর 1:John 5:7 এ আছেঃ

“For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit: and these three are one.”

এখানে trinity এর উল্লেখ থাকলেও, Revised Standard version এর 1:John 5:7 এ আছে,

“And the Spirit is the witness, because the Spirit is the truth”

এখানে trinity এর চিহ্নও নেই। একই বাইবেলের একই লাইনে দুই version এ God এর বৈশিষ্ট্য দুইরকম।

তাই বলার অপেক্ষা রাখেনা আমাদের শেষ দুটো মানদন্ডেও বাইবেল উত্তীর্ণ হতে পারেনা। ফলে আমাদের এই আলোচনায় এটা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে প্রমাণিত যে ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্ম কখন সত্য হতে পারেনা। কেননা তাদের দাবীকৃত ঐশী গ্রন্থ আমাদের যৌক্তিক মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়নি।

- **বৌদ্ধ ধর্ম**

বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে কিছু বলার আগে, একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিৎ। সেটা হল বৌদ্ধ ধর্ম যতটা না ধর্ম, তার চেয়ে বেশি Philosophy বা দর্শন। তাই ধর্মের বিশ্লেষণে বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা অনেকটাই বেমানান হলেও প্রচলিত ধর্ম বলেই তা আলোচনায় আনা হল।

প্রথমত, বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ প্রাথমিক অবস্থায় ছিলেন সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম অনুসারী। তার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। বৌদ্ধ ধর্ম মতে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে নিজেই সত্য স্বত্বার সন্ধানে ধ্যানমগ্ন হন। ফলে তিনি দীর্ঘ সাধনার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন।

গৌতম বুদ্ধ সরাসরি স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে আলোচনা করতে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মনে করতেন মানুষের কোন প্রয়োজন নেই স্রষ্টার ব্যাপারে জানার। স্রষ্টা বলে কিছু আছে কি নেই, সেটা জানারও কোন প্রয়োজন নেই। তাকে যখন তার একজন শিষ্য স্রষ্টা আছে কি নেই জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

"আমাদের যদি পেট ব্যাথা হয়, তাহলে আমরা কি তা নিরাময়ের চেষ্টা করবো, নাকি ডাক্তারের প্রেসকিপশান নিয়ে পড়ালেখা করব? স্রষ্টা আছে কি নেই, তাতে আমাদের কিছুই যায় আসেনা। আমাদের কাজ হল এই পৃথিবী থেকে দুঃখ কষ্ট দূর করা।"

তাছাড়া গৌতম বুদ্ধের বিভিন্ন বাণীর যে সংগ্রহ, সেইসব সংগ্রহ বা বই থেকে তার কিছু বক্তব্য পাওয়া যায়, যাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে কোনরূপ সোজাসাপ্টা কথা বলতে রাজি ছিলেন না। বরং এ পৃথিবীতে দুঃখ বিগ্রহ দেখে স্রষ্টার প্রতি তার ক্ষোভ ফুটে উঠেছিল বিভিন্ন বাণীতে।

"He who has eyes can see the sickening sight,
Why does not Brahma set his creatures right?
If his wide power no limit can restrain,
Why is his hand so rarely spread to bless?
Why are his creatures all condemned to pain?
Why does he not to all give happiness?
Why do fraud, lies, and ignorance prevail?
Why triumphs falsehood -- truth and justice fail?
I count you Brahma one th'unjust among,
Who made a world in which to shelter wrong.**"** [9]

[9] Bhuridatta Jataka: vol. 6, p. 110. Translation by E. B. Cowell and W. H. D. Rouse

উপরের শ্লোকগুলোতে প্রশ্ন করা হচ্ছে কেন স্রষ্টা তার সৃষ্টিকে সঠিক পথে চালালেন না? কেন সৃষ্টি এত কষ্টে আছে? কেন স্রষ্টা সবাইকে সুখী করছেন না? কেন প্রতারণা, মিথ্যে আর অজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে? কেন ন্যায়পরায়ণতা নেই? তাই স্রষ্টা ন্যায়নীতিহীন।

স্রষ্টার কোন স্পষ্ট ধারণা না দিলেও, 'ব্রহ্মা' নামে একটি অতিপ্রাকৃত সত্ত্বার কথা বারবার বলা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে। কিন্তু এই ব্রহ্মাকে দেবা (Devas) দের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দেবা বলে ধারণা করা যায় বিভিন্ন শ্লোক বিবেচনা করলে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ট্রিপিটকে অনেক রকম দেবার কথা এসেছে। দেবারা মানুষের মত নয়। তাদের জীবন আর দুনিয়াও আলাদা। তাদের মাঝে ব্রহ্মা হল সর্বোচ্চ ক্ষমতাশীল। তবুও দেবাদের স্রষ্টা দাবি করা হয়নি।

এছাড়া স্রষ্টাকেও "পাপ" থেকে মুক্ত মানা হয়নি কিছু ক্ষেত্রে। যেমন,

"If there exists some Lord all powerful to fulfil
In every creature bliss or woe, and action good or ill;
That Lord is stained with sin.
Man does but work his will.
If such the creed thou holdst and this be doctrine true,
Then was my action right when I that monkey slew.
Couldst thou but only see how sinful is thy creed,
Thou wouldst no longer then with reason blame my deed."10

উপরের শ্লোকে বলা হচ্ছে যদি কোন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা থেকে থাকে, তবে তার গায়ে পাপ লেগে আছে।

আবার,

"If beings experience pleasure & pain based on the creative act of a supreme god, then obviously the Niganthas have been created by an evil supreme god, which is why they now feel such fierce, sharp, racking pains."

"যদিঅসীম স্রষ্টার সৃষ্টিশীল কর্মের কারণে সৃষ্টি সুখ ও দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করে করে, তাহলে অবশ্যই ভিক্ষুরা একজন শ্রেষ্ঠ 'শয়তান' স্রষ্টা দ্বারা সৃষ্ট। যার ফলে তারা এত কঠিন কষ্ট পাচ্ছে।"[11]

[10] MAHĀBODHI-JĀTAKA Vol. 5, page 122-123. Translation by E. B. Cowell and W. H. D. Rouse

[11] Devadaha Sutta, No.101, Majjhima Nikaya. Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu

এখানে স্রষ্টাকে শয়তান এর সাথে তুলনা করা হচ্ছে।

প্রায় সব শ্লোকেই ‘IF THERE EXISTS A POWERFUL LORD’ বা ‘যদি কোন শক্তিশালী ঈশ্বর থেকে থাকেন’ – এই জাতীয় বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে সংশয় প্রকাশ করতে। বৌদ্ধ ধর্মের অনেক SCHOLAR বা পণ্ডিতরাও এটা স্বীকার করেছেন যে স্রষ্টার অস্তিত্বের কোন সরাসরি জবাব বুদ্ধ থেকে পাওয়া যায়নি।

জার্মানীতে জন্ম নেয়া শ্রীলংকান থেরাভেদা (বৌদ্ধ ধর্মের সবচে প্রাচীন শাখা) ভিক্ষু নায়ানাপনিকা থেরা (Nyanaponika Thera) তার Buddhism and the God-idea নামক বই এ লিখেছেন,

“পালি মৌলসমূহ, যেখানে বুদ্ধের বাণীসমুহ লিপিবদ্ধ আছে, তা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, একজন ব্যক্তি স্বত্বা; একজন অসীম ও সার্বভৌম স্রষ্টা ঈশ্বরের ধারণা কখনই বুদ্ধের শিক্ষার সাথে যায়না।”

“From a study of the discourses of the Buddha preserved in the Pali canon, it will be seen that the idea of a personal deity, a creator god conceived to be eternal and omnipotent, is incompatible with the Buddha's teachings.**”**

“বৌদ্ধ সাহিত্যে, একজন স্রষ্টা ঈশ্বরের কথা প্রায়শই এসেছে এবং একই সাথে পৃথিবী সৃষ্টির অন্যান্য দাবীকৃত কারণের প্রমাণসমুহসহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত- ও হয়েছে”

“In Buddhist literature, the belief in a creator god (issara-nimmana-vada) is frequently mentioned and rejected, along with other causes wrongly adduced to explain the origin of the world.**”**

তাই বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে আমাদের আর আলোচনা করার কোন সুযোগই নেই, কেননা এই ধর্ম প্রথমত দার্শনিক, দ্বিতীয়ত নাস্তিকতামুখী। তাই স্রষ্টার অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করে কিংবা এড়িয়ে যেতে চায় কিংবা স্রষ্টাকে দোষারোপ করে, এমন কোন দর্শন স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসতে পারে, এই ধারণা অবিশ্বাস্য। তাই আমাদের মানদন্ডের প্রথম পর্যায়েই বৌদ্ধ ধর্ম উত্তীর্ণ হতে পারেনা।

- **হিন্দু ধর্ম**

হিন্দু ধর্ম নামটি হিন্দু ধর্মের আসল নাম নয়। সিন্ধু নদের নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থানরত জাতিকে নির্দেশ করতেই হিন্দু শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই নদের কথা “রিগ বেদ” এ উল্লেখ করা হয়। সিন্ধু নদকে “Indus River” নামেও অভিহিত করা হয়। ১৮ শতাব্দির শেষ

দিকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও সাম্রাজ্যবাদীরা যখন ভারত উপমহাদেশে আসতে শুরু করে, তারা ভারতের ধর্ম অনুসারীদের একত্রে "হিন্দু" বলা শুরু করে। অনেকের মতে পারস্যের ভাষায় হিন্দু শব্দটি উৎপত্তি লাভ করে এরাবিক "Al Hind" শব্দ থেকে যার অর্থ Indus River এর আশেপাশে অবস্থানরত মানুষ। ১৯ শতাব্দিতে প্রথম ইংরেজি ভাষায়, ভারতীয় ধর্মকে HINDUISM হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

হিন্দু ধর্মের আসল নাম হল সনাতন ধর্ম।

সনাতন ধর্মগ্রন্থ মূলত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সমস্ত ধর্মগ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত। শ্রুতি এবং স্মৃতি।

শ্রুতি মূলত বেদকেই বোঝায়। বেদ হল ৪ টি *ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সমবেদ ও অথর্ববেদ।*

স্মৃতি বলতে সে সব গ্রন্থকেই বোঝায়, যা শ্রুতির বাইরে অবস্থান করে। যেমন, *মহাভারত, রামায়ণ ও ভগবাদ গীতা।* যদিও ভগবাদ গীতাকে মহাভারতেরই একটি অংশ ধরা হয়, তবুও অনেক সময় একে শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

ভারতে একটি কথা প্রচলিত আছে, যে স্মৃতি শ্রুতিকে অনুরসরণ করে। অর্থাৎ, যদি স্রষ্টা সম্পর্কে জানতে হয়, তবে শ্রুতি অধ্যয়ন অগ্রাধিকার পাবে। এ কথা সত্যিই যৌক্তিক, কেননা স্মৃতির যে দুটো গ্রন্থ আছে, তার একটি স্পষ্টই স্রষ্টা প্রদত্ত নয় বরং মানব রচিত মহাকাব্য। যেটা হল *রামায়ণ।* কারণ রামায়ণের রচয়িতা হলেন *বাল্মিকি* যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের আদিকবি নামে পরচিত। ধারণা করা হয় তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের কবি। তাকে আদিকবি বলার কারণ তিনিই প্রথম সংস্কৃত কাব্যে শ্লোকের রচয়িতা বলে ধারণা করা হয়। তিনি *রামায়ণ* ব্যতীত *যোগবশিষ্ঠ* নামক অপর এক সনাতন ধর্মীয় গ্রন্থের রচয়িতা।

অপরদিকে *মহাভারতের* রচয়িতা হলেন *ব্যাসদেব* যিনি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে একজন ঋষি বিশেষ। মহাভারত অনুসারে, তিনি দেবতা গণেশকে নির্দেশ দেন মহাভারতের শ্লোক লিখে রাখার জন্যে। তিনি শ্লোক তৈরি করতেন আর গণেশ লিখে রাখতেন।

ঐশী বাণীর যে শর্তে আমরা শুরুতেই একমত হয়ে এগিয়েছি, তার সাথে এই দাবি মোটেই খাপ খায়না। একজন ঋষি বা সৃষ্টি, একজন স্রষ্টার অংশ বা দেবতাকে ঐশী বাণী লিখতে বলছেন, এই বিষয়টা অযৌক্তিক বিধায় মহাভারতকে ঐশী বাণী মেনে নেয়া যৌক্তিকভাবেই অসম্ভব। তারপরেও যেহেতু এটা স্রষ্টার বাণী বলেই দাবীকৃত, তাই আমাদের আলোচ্য ধর্মগ্রন্থ হবে 'বেদ' এবং মহাভারতের অংশ দাবীকৃত 'ভগবাদ গীতা' দুটোই।

প্রথমেই আমরা স্রষ্টার সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যালোচনা করতে গেলে দেখতে পাই স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গীতা এবং বেদে রয়েছে বৈপরীত্য।

যেমন *বেদের* দিকে যদি নজর দিই,

"He, like the Unborn, holds the broad earth up; and with effective utterance fixed the sky."[12]

"অগ্নি অজাত পুরুষের মত পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ধারণ করে আছেন এবং সত্য মন্ত্র দ্বারা আকাশ ধারণ করেছেন।"

এখানে দেখা যাচ্ছে স্রষ্টার একত্ববাদ এবং স্রষ্টার যে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য, তার কথা। যেমন তিনি জন্ম নেন না। এছাড়াও যজুর্বেদ বলা আছে,

"There is no counterpart of him whose glory verily is great.**"**[13]

"এ পুরুষের (ব্রহ্ম) তুলনা দেবার কোন বস্তু নেই"[14]

"This very God pervadeth all the regions; yea, born aforetime, in the womb he dwelleth.**"**[15]

"হে মনুষ্যগণ! ইনিই প্রথমে ছিলেন, গর্ভমধ্যেও তিনিই এবং জনিষ্যমানও তিনিই"

ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে,

"They call him Indra, Mitra, Varuṇa, Agni, and he is heavenly nobly-winged Garutmān. To what is One, sages give many a title they call it Agni, Yama, Mātariśvan."[16]

"এই আদিত্যকে মেধাবিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয় পক্ষীবিশিষ্ট ও সুন্দরগমণশীল। ইনি এক হলেও একে বহু বলে বর্ণনা করে"

কিন্তু *ভগবাদ গীতায়* দেখা যায়,

---

[12] Rigveda 1.67.3, Translation by Ralph T.H. Griffith, (1896)

[13] The Texts of the White Yajurveda *32.3*, tr. Ralph T.H. Griffith, (1899)

[14] বেদ সমগ্র – ডঃ অলোক কুমার সেন, নারায়ণ পুস্তকালয়, কোলকাতা। এ সংকলনের পরবর্তী অনুবাদগুলোও এখান থেকে নেয়া হবে।

[15] The Texts of the White Yajurveda *32.4*, tr. Ralph T.H. Griffith, (1899)

[16] The Texts of the White Yajurveda *1.164.46*, tr. Ralph T.H. Griffith, (1899)

“Whenever, O descendant of Bharata, there is decline of Dharma, and rise of Adharma, then I body Myself forth.”[17]

“পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং পাপ বৃদ্ধি পায়, তখনই আমি শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই”

এখানে দেখা যাচ্ছে স্রষ্টা নিজেই সৃষ্টির রূপ নেবেন এবং জন্ম নেবেন বলে ঘোষণা করছেন যা স্পষ্টতই বেদে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বেদে বলা হচ্ছে স্রষ্টা জন্ম নেন না, কিন্তু গীতায় বলা হচ্ছে তিনি জন্ম নেন।

স্রষ্টার এই মানুষ রূপে জন্ম নেয়াকে বলা হয় অবতারবাদ। যদিও অনেক হিন্দু চিন্তাবিদ এটাকে নব আবিষ্কৃত বলে অস্বীকার করতে চান, তবুও এটা সনাতন ধর্মের একটি মৌলিক বিশ্বাস। এটাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। সনাতন ধর্ম মতে স্রষ্টা বিষ্ণুর প্রায় ১০ টি অবতার রয়েছে। অর্থাৎ স্রষ্টা বিষ্ণু ১০ রকম সৃষ্টির রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। এর মধ্যে সবচে পরিচিত হল কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণর মুখেই বলা হয়েছে,

“I am the Father of this world, the Mother, the Sustainer, the Grandfather; the Purifier, the (one) thing to be known, (the syllable) Om, and also the Rik, Sâman and Yajus.”[18]

“আমি জগতের পিতামাতা। আমি কর্মের ফলদাতা। আমি পবিত্র ওঙ্কার। আমি পিতামহ। আমি বিধাতা”

“Animating My Prakriti, I project again and again this whole multitude of beings, helpless under the sway of Prakriti”[19]

“আমি আমার মায়া দ্বারাই কর্মাধীন জীবগণকে বার বার সৃষ্টি করি”

---

[17] Bhagavad-gītā 4.7, English translation and commentary by Swami Swarupananda, (1909)

[18] Srimad-Bhagavad-Gita *9.17*, English translation and commentary by Swami Swarupananda, (1909)

[19] Bhagavad-Gita 9.8, English translation and commentary by Swami Swarupananda, (1909)

"And whatsoever is the seed of all beings, that also am I, O Arjuna. There is no being, whether moving or unmoving, that can exist without Me."[20]

"আমি ভূতগণের বীজ। এই চরাচরে আমি ছাড়া আর কিছুই নেই।"

"I am the origin of all, from Me everything evolves;—thus thinking the wise worship Me with loving consciousness."[21]

"আমা হতে এই জগতের প্রবর্তন- তা জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন"

"I am the origin and dissolution of the whole universe"[22]

"এই বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহারের কর্তা আমি"

এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কৃষ্ণ নিজেকে স্রষ্টা বলেই পরিচয় দিয়েছেন। অবতারবাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটা অসামাঞ্জস্য কিছু নয় বরং তা যৌক্তিক। কারণ অবতারবাদে স্রষ্টাই সৃষ্টির রূপ নিয়ে জন্ম নেন। তাই এটাকে যদি কেউ আধুনিক আবিষ্কার বলে অস্বীকার করেন, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়।

তাই স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা স্পষ্ট বৈপরীত্য বিদ্যমান বেদ ও গীতার মাঝে।

আমাদের তৃতীয় মানদন্ড অনুসারে, স্রষ্টার সংখ্যা নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য না থাকায়, বরঞ্চ বৈপরীত্য থাকায়, বেদ ও গীতাকে ঐশী বাণী হিসেবে কখনই মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

আমাদের চতুর্থ মানদন্ডের আমরা বলেছিলাম ধর্মগ্রন্থ এককভাবে স্রষ্টার একত্ববাদের কথা উল্লেখ থাকতে হবে। কিন্তু বেদে এককভাবে স্রষ্টার একত্ববাদের কথা উল্লেখ থাকলেও গীতায় গিয়ে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বহু ঈশ্বরবাদ নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা আগেই স্পষ্ট করেছি কেন স্রষ্টাকে একজনই হতে হবে। আমরা এটাও স্পষ্ট করেছি যে অবতারবাদ

---

[20] Bhagavad-Gita 10.39, English translation and commentary by Swami Swarupananda, (1909)

[21] Bhagavad-Gita 10.8, English translation and commentary by Swami Swarupananda, (1909)

[22] Bhagavad-Gita 7.6, English translation and commentary by Swami Swarupananda, (1909)

স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ ভগবদগীতার একটা চুম্বক অংশই হল অবতারবাদের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো।

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, যে গীতার কথা না হয় বাদ দেয়া গেল, তাহলে বেদ নিশ্চই সঠিক। তাহলে চলুন এবার দেখি, স্বয়ং বেদেই স্রষ্টা অথবা সনাতন ধর্ম মতে "স্রষ্টার অংশ" দেবতার সংখ্যা সম্পর্কে কি ধরনের বিপরীতমুখী তথ্য দেয়া আছে।

আমরা আগে বেদের বিভিন্ন ভাগ থেকে একাধিক মন্ত্র (Verse) উল্লেখ করে দেখিয়েছি সেখানে স্রষ্টার একত্ববাদের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু নিচের Verse গুলো ভিন্নতা পোষণ করে।

"The Deities three hundred and thirty-nine, have served and honoured Agni, Strewn sacred grass, anointed him with butter, and seated him as Priest, the Gods' Invoker.**"**[23]

অর্থাৎ, তিন শত ত্রিশ ও নয়জন দেবতা অগ্নির পরিচর্যা করেছেন। তাকে ঘৃত দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন। তাঁর জন্যে কুশ বিস্তার করে দিয়েছেন এবং তাকে হোতারূপে উপবেশন করিয়েছেন।[24]

এখানে দেখা যাচ্ছে দেবতা বা স্রষ্টার অংশীদারের সংখ্যা বলা হচ্ছে ৩৩৯। এরা আবার অগ্নি দেবতার সাথে দেখা করে, তাকে ঘী নিবেদন করে তাকে নেতা বানিয়ে মোট ৩৪০ জন দেবতায় পরিনত হয়।

কিন্তু আবার,

"Three times a hundred Gods and thrice a thousand, and three times ten and nine have worshipped Agni, For him spread sacred grass, with oil bedewed him, and stablished him as Priest and Sacrificer.**"**[25]

---

[23] Rig veda book the 10th, Hymn 52:6, Translation by Ralph T.H. Griffith, (1896)

[24] অদ্ভুত হলেও সত্য, ডঃ অলোক কুমার সেন এর সম্পাদনায় কোলকাতার নারায়ণ পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত "বেদ সমগ্র" তে উক্ত মন্ত্রের অনুবাদ করা হয়েছে 'তিন সহস্র তিন শত ত্রিশ ও নয়জন' হিসেবে। যেখানে Ralph Thomas Hotchkin Griffith এর অনুবাদ হিন্দুসমাজে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, সেখানে তাঁর অনুবাদের সাথে এই অনুবাদ দৃষ্টিকটূভাবে সাংঘর্ষিক। তবুও আমরা ধরে নিচ্ছি এটি ছাপার ভুল।

[25] Rig veda book the 3rd Hymn 9:9, Translation by Ralph T.H. Griffith, (1896)

“তিন সহস্র তিন শত ত্রিৎশৎ ও নবসংখ্যক দেবগণ অগ্নিকে পূজা করেছেন, ঘৃতদ্বারা সিক্ত করেছেন এবং তাঁর জন্য কুশ বিস্তৃত করেছেন। তারপরে তাকে হোতারূপে কুশোপরি উপবেশন করিয়েছেন”

এখানে দেখা যাচ্ছে দেবতা বা স্রষ্টার অংশীদারের সংখ্যা বলা হচ্ছে ৩৩৩৯। এরা আবার অগ্নি দেবতার সাথে দেখা করে, তাকে ঘী নিবেদন করে তাকে নেতা বানিয়ে মোট ৩৩৪০ জন দেবতায় পরিনত হয়।

আরো একবার,

“O ye eleven Gods whose home is heaven, O ye eleven who make earth your dwelling. Ye who with might, eleven, live in waters, accept this sacrifice, Ye Gods, with pleasure.**”**[26]

“হে দেবগণ, তোমরা নিজ নিজ মহিমায় দ্যুলোকে একাদশ সংখ্যক, পৃথিবীতে একাদশ সংখ্যক, অন্তরীক্ষে একাদশ সংখ্যক হয়ে বাস কর। হে দেবগণ, তোমরা যজনীয় ভোগ কর”

আর এখানে দেখা যাচ্ছে দেবতার সংখ্যা হল ৩৩। যার ১১ জন আকাশের, ১১ জন মর্ত্যের, ১১ জন জলের।

বেদকে দাবি করা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসেবে, যা স্রষ্টা কর্তৃক ঋষিদের ওপর দীর্ঘ সময় ধরে প্রেরণ করা হয়েছে। এটাও দাবি করা হয় এতে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

কিন্তু আমরা আমাদের নিরপেক্ষ, যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনা থেকে দেখতে পাচ্ছি, যে আমাদের অন্যতম প্রধান দুটি মানদন্ড, স্রষ্টার নির্দিষ্ট সংখ্যা ও এককভাবে একত্ববাদের ব্যাপারে বেদে রয়েছে চরম বৈপরীত্য। কখনো একজন স্রষ্টা দাবি করা হচ্ছে, কখনও অবতারবাদ বা স্রষ্টার সৃষ্টিতে রূপান্তর দাবি করা হচ্ছে, কখন স্রষ্টার অংশ ৩৩, ৩৪০ কিংবা ৩৩৪০ পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে। যার প্রতিটি দাবি আমাদের নিরপেক্ষ মানদন্ডের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থখানি পূর্বের অবস্থায় নেই। অবশ্যই এতে মানুষের হাত লেগেছে যার ফলে স্রষ্টার সংখ্যা নিয়ে এমন দৃষ্টিকটু বৈপরীত্যের অবতারণা ঘটেছে। আমরা যদি ধরেও নিই যে বেদ স্রষ্টা প্রদত্ত, তবুও এটা যৌক্তিক ভাবে দাবি করা অসম্ভব, যে তা অপরিবর্তিত। স্বয়ং স্রষ্টা এমন কিছু প্রেরণ করবেন, যেখানে তার নিজের সংখ্যার ব্যাপারে রয়েছে ভয়ানক গরমিল, যেখানে তার বৈশিষ্ট্যের সাথে

[26] Rig veda book the 1st hymn 139:11, Translation by Ralph T.H. Griffith, *(*1896*)*

বৈপরীত্যমূলক অবতারবাদকে মৌলিক ধারণারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সেটা স্রষ্টার পক্ষ থেকেই হতে পারেনা। অবশ্যই তা মানুষের হাতে পরিবর্তিত।

তাই আমাদের মানদন্ড অনুসারে, এটা সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যে সনাতন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ স্রষ্টার বাণী নয়। বাইবেলের মতই এতে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই একে স্রষ্টার বানী কিংবা স্রষ্টার অপরিবর্তিত বাণী মেনে নেয়া সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। আমাদের এই আলোচনায় এটা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে প্রমাণিত সনাতন ধর্ম কখন সত্য হতে পারেনা। কেননা তাদের দাবীকৃত ঐশী গ্রন্থ আমাদের যৌক্তিক মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়নি।

আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য ধর্ম হল ইসলাম। কিন্তু এই আলোচনার পূর্বে আমরা অপ্রচলিত অন্যান্য ধর্ম নিয়ে আর আলোচনা করবোনা, কেননা বেশিরভাগ অপ্রচলিত ধর্মের কোন নির্দিষ্ট ঐশী ধর্মগ্রন্থ নেই। নেই নির্দিষ্ট কোন স্রষ্টার বাণীর দাবি। এইসব ধর্মের বেশিরভাগই দার্শনিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতের শিখ ধর্ম। এই ধর্মের প্রবক্তা গুরু নানক, যিনি ছিলেন সনাতন ধর্মের ক্ষত্রীয় গোত্রের একজন হিন্দু, তিনি একটি নতুন দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েই এই ধর্ম চালু করেন। তাছাড়া তিনি “কবির” নামে একজন মুসলিম সাধক হতেও অনুপ্রাণিত হন। মূলত হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এই দুই ধর্ম থেকে অনেক কিছু একসাথে মিশিয়ে তিনি এই নতুন ধর্ম চালু করেন। তাই আমাদের এই যৌক্তিক আলোচনায় এমন সব “দার্শনিক ধর্ম” অবধারিতভাবেই বাদ থাকছে।

- **ইসলাম**

ইসলাম ধর্মের ঐশী ধর্মগ্রন্থ হল কুরআন। আসুন, এই কুরআনকে আমরা আমাদের মানদন্ডের আলোকে বিচার করি।

✓ **প্রথম ও দ্বিতীয় মানদন্ডঃ ধর্মগ্রন্থে সংযোজন ও বিয়োজন**

কুরআনের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা একসাথে ইসলামের দাবীকৃত নবীর উপর আসেনি। ২৩ বছর ধরে ধীরে ধীরে প্রয়োজন অনুসারে, একটু একটু করে, সময়োপযোগী উপায়ে তা এসেছে। ইতিহাসে জানা যায়, ২৩ বছর পর, যখন এই ঐশী ধর্মগ্রন্থ এর আগমন সমাপ্ত হয়, ইসলামের নবী তা স্রষ্টার নির্দেশ মোতাবেক বর্তমানের বিভিন্ন অধ্যায় (Chapter) অনুসারে সজ্জিত করেন।

সেই অধ্যায় অনুসারে সজ্জিত করার দিন থেকে আজ অব্দি কুরআনের এমন কোন কপি এই ১৪০০ বছরে পাওয়া যায়নি, যেখানে কোন নতুন অধ্যায়, বা নতুন বাক্য, বা নতুন একটা শব্দ যোগ করা হয়েছে। এমনকি এই প্রায় দেড় হাজার বছরে, কুরআনের

একটা অধ্যায়, বা একটা বাক্য, বা একটা শব্দ পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়নি। আমরা বিশ্লেষনের জন্যে কুরআনের ঐতিহাসিক ব্যবচ্ছেদ যদি করতে যাই, তাহলে দেখতে পাই কুরআন ১৪০০ বছর আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। কোন রকম সংযোজন বা বিয়োজন এতে সাধিত হয়নি। এমন কোন কপি কেউ কখনও উপস্থাপন করেনি, যেখানে সামান্যতম এদিক ওদিক রয়েছে। পৃথিবীর এক প্রান্তে কুরআন যেমন, অপর প্রান্তেও তেমন। শত শত বছর আগে যেমন, আজও তেমন।

বিখ্যাত স্কটিশ ওরিয়েন্টালিস্ট *(যারা মুসলিম নন, কিন্তু ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেন)* ও কলনিয়াল এডমিন্সট্রেটর স্যার *উইলিয়াম মুইর* (Sir William Muir) কুরআনের ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট অধ্যয়নের পরে উল্লেখ করেন,

"সম্ভবত পৃথিবীতে আর কোন লেখা নেই যেটি ১২০০ বছর ধরে অবিকল অবস্থায় আছে।"

"There is probably in the world no other work which has remained twelve centuries with so pure a text."[27]

স্কটিশ ইতিহাসবিদ ও ওরিয়েন্টালিস্ট স্যার হ্যামিলটন *আলেক্সান্ডার রসকিন গিব* (Sir Hamilton Alexander Rosskeen Gibb) লেখেন,

"এটি যৌক্তিকভাবেই মনে হয় সুপ্রতিষ্ঠিত যে, (কুরআনে) কোন প্রকার বস্তুগত পরিবর্তন সাধিত হয়নি আর মুহাম্মাদের (স) বাণীগুলো যথাযথভাবে মৌলিক রূপেই সংরক্ষিত আছে।"

"It seems reasonably well established that no material changes were introduced and that the original form of Muhammad's discourses was preserved with scrupulous precision."[28]

জার্মান ওরিয়েন্টালিস্ট *ফ্রেডরিক শোয়ালি* (Friedrich Schwally) লেখেন,

"বিভিন্ন ঐশীবাণীর ওপর ভিত্তি করে যা বলা যায়, তা হল আমরা আত্মবিশ্বাসী হয়েই বলতে পারি, যে তাদের মূল লিখন সাধারণ ভাবে অবিকল সেভাবেই হস্তান্তরিত হয়েছে, যেভাবে নবীর জীবনে পাওয়া গিয়েছিল।"

---

[27] Sir William Muir, The Life of Mahomet, London: Smith, Elder and Company, 1878

[28] Mohammedanism, London: Oxford University Press, 1962. p.25

“As far as the various pieces of revelation are concerned, we may be confident that their text has been generally transmitted exactly as it was found in the Prophet’s legacy.**”**[29]

অর্থাৎ, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না, যে কুরআনে কোন পরিবর্তন এসেছে। এটা যে শুধুমাত্র মুসলিমদের অন্ধ দাবি, তা নয়। উপরে আমরা বিভিন্ন ওরিয়েন্টালিস্টদের বক্তব্য থেকে এটা নিশ্চিত হতে পারি যে এর পেছনে কোন ধর্মীয় আবেগ নেই। এটা ঐতিহাসিক ভাবেই প্রমাণিত, যে কুরআনে আদৌ কোন পরিবর্তন আসেনি। ফলে এটা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে কুরআনে কোন রকম মানুষের হাত লাগেনি।

তাই আমাদের প্রথম দুটি মানদন্ডে কুরআন উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু তবুও এটাকে ঐশী বলা যাচ্ছেনা। কারণ শুধু অপরিবর্তনীয় থাকাটাই ঐশী হওয়ার প্রমাণ নয়। কেননা অপর দুটি মানদণ্ড এখনো বাকি রয়েছে।

✓ তৃতীয় ও চতুর্থ মানদন্ডঃ স্রষ্টার সংখ্যা ও একত্ববাদ

স্রষ্টার সংখ্যা নিয়ে কুরআনের বক্তব্য দেখতে গেলে দেখা যায় কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই স্রষ্টার সংখ্যা এক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

“To the 'Ad people, (We sent) Hud, one of their (own) brethren: He said: O my people! worship Allah! ye have no other god but Him will ye not fear (Allah)?**”** [Al-A 'raf 7 :65]

“আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় করেবেনা?”

“And to (the tribe of) Thamud (We sent) their brother Salih. He said, "O my people! Worship Allah alone! You have no god besides Him. A clear evidence has now come to you from your Lord**”** [Al-A'raf 7:73]

“সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে।”

---

[29] Geschichte des Qorans von Theodor Nöldeke, (Zweite Auflage bearbeitet von Friedrich Schwally), Teil 1: Über den Ursprung des Qorans, Weicher, Leipzig, 1909, Vol.2, p.120.

“And to Midian (We sent) their brother Shu'ayb. He said, "O my people! Worship only Allah! You have no god besides Him. Clear proof has now come to you from your Sustainer.” [Al-A'raf 7:85]

“আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে”

“Verily, I, and I alone, am Allah! There is no god but Me! So serve Me and be constant in prayer in order to keep Me in your remembrance” [Ta Ha 20:14]

“আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।”

“We sent no Messenger before you without revealing to him, "There is no god but Me, so worship Me (alone).” [Al-Anbiya 21:25]

“আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর”

“Say, "He is Allah, the One; Allah the Self-Sufficient; He begets not, nor is He begotten; and there is nothing that could be compared with Him.” [Al-Ikhlas 112]

“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই”

“There is nothing like Him.” [Al-Shura 42: 11]

“কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়”

“So do not make any analogy to Allah.” [Al-Nahl 16:74]

“অতএব, আল্লাহর কোন সদৃশ সাব্যস্ত করো না”

“Such is Allah, your Sustainer. There is no god but He, the Creator of everything. Worship, then, Him alone, for He has everything in His care**”** [Al-An 'am 6: 102]

“তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী”

“O people! Call to mind the favor of Allah upon you! Is there any creator other than Allah that could provide for you sustenance out of heaven and earth? There is no god but Him. So where else can you turn to?**”** [Fatir 35:3]

“হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?”

“And He is Omnipotent over His servants. He sends forth heavenly forces to guard you. And when death comes to one of you, Our angels take his soul, and they never fail in their duty. Then they are brought before Allah, their Just Protector and Lord of Truth. Surely His is the judgment. And He is most swift in taking account.**”** [Al-An 'am 6:61-62]

“তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমন কি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয়। অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহর কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন”

এই ধরণের অসংখ্য Verse কুরআনে পাওয়া যায়, যেখানে স্রষ্টা নিজেকে *“আল্লাহ্”* নামে পরিচয় দিয়ে তার একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এমন একটা আয়াতও পাওয়া যায়না, যেখানে স্রষ্টার সংখ্যা একাধিক বলা হয়েছে, বা মনে হয় যে স্রষ্টার সংখ্যা একাধিক। কুরআনে স্রষ্টার সংখ্যার গরমিল যদি কেউ খুঁজতে যান, তবে একপ্রকার আশাহতই হতে হয় কারণ স্রষ্টার একত্ববাদ নিয়ে কুরআনে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া দেয়া হয়নি।

তদুপরি কুরআনে একের অধিক স্রষ্টার ধারণাকেও বাতিল করে দেয়া হয়েছে এই Verse দিয়ে।

"If there were, in the heavens And the earth, other gods Besides Allah, there would Have been confusion in both! But glory to Allah, The Lord of the Throne: (High is He) above What they attribute to Him!" [Al-Anbiya 21:22]

"যদি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।"

কুরআনের অধিকাংশ স্থানে একত্ববাদের কথাই ঘুরেফিরে এসেছে। সেখানে একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাস কিংবা "আল্লাহ্" কে ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে বিশ্বাস বা দ্বিতীয় কাউকে কোনভাবে মেনে চলাকে কুরআনে "*শির্ক*" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ partnership. এবং এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ একক স্রষ্টা "আল্লাহ্র" সাথে আর কারো partnership চলবেনা। শুধু এককভাবে আল্লাহ্কেই স্রষ্টা মানতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে।

তাছাড়া কুরআনে কিছু ধর্মমতবাদের মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপারেও আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন, খৃষ্টবাদ বা মূর্তিপুজা। আমরা আগেই দেখেছি এইসব ধর্ম একক স্রষ্টায় বিশ্বাস করেনা। বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। কুরআনে, স্রষ্টা খৃষ্টবাদের ত্রিতত্ত্ব বা Trinity কিংবা স্রষ্টার সন্তানধারণ (যা আমাদের আলোচনার শুরুতেই পরিষ্কার করেছি যে এটা স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যের সাথেই যায়না) সংক্রান্ত বিশ্বাসগুলোকে পুরোপুরি অসার দাবি করে তা বাতিল ঘোষণা করেছেন। মূর্তিপুজকদের (idol worshipers) "*মুশরিক*"(Mushrik: যারা স্রষ্টার সাথে অন্য কাউকে partner বানিয়ে নেয়) উল্লেখ করে, তাদের বিশ্বাসকেও অযৌক্তিক ও অসার উল্লেখ করে তা বাতিল ঘোষনা করে।

এমন একটা Verse বা আয়াত কুরআনের শুরু থেকে শেষ অব্দি পাওয়া যায়না, যেখানে সামান্যতমও সন্দেহ জাগতে পারে, যে স্রষ্টা কি একের অধিক কিনা। কারণ দেখা যায়, কুরআনের মৌলিক বিষয়ই হল স্রষ্টার একত্ববাদ। এটাই যেন কুরআনের প্রধান বাণী।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারটি মানদন্ডের প্রতিটিতেই উত্তীর্ণ হতে পেরেছে শুধুমাত্র কুরআন।

প্রিয় পাঠক,

সুস্পষ্টভাবে যৌক্তিক বিচার আর বাস্তবিক জ্ঞান ব্যবহার করে আমরা দেখতে পাচ্ছি একমাত্র ইসলাম ধর্মই স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত বলেই মেনে নেয়া যায়। আর একটা ধর্মও নয়। তবে আমি জানি আপনার মন এখনও হয়তো দ্বিধান্বিত। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ এই বিষয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বিশ্বাস করার ওপর নির্ভর করছে আপনার গোটা জীবন, আপনার জীবন ব্যবস্থা, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি। যদিও কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে ওপরের যৌক্তিক বিশ্লেষণই কুরআন ও ইসলামকে স্রষ্টা প্রদত্ত মেনে নেয়ার জন্যে প্রয়োজনের অধিক, তারপরেও আসুন আমরা আরেকটু এগিয়ে যাই।

মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে ইসলাম ধর্মের দাবীকৃত নবী বা prophet কে? তার দাবি "কুরআন স্রষ্টার বাণী" এটা কেন বিশ্বাস করবো?

এর উত্তর হল ইসলামের Propeht বা বার্তাবাহক/নবী হলেন মুহাম্মাদ (স)। তিনি দাবি করেছেন তাকে স্রষ্টা এই কুরআন পাঠিয়েছেন আর তাকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এখন আসুন, কেন তাকে বিশ্বাস করবো, সেই আলোচনায় যাই।

প্রথমে তাকে অবিশ্বাস করার মত মৌলিক অভিযোগ বা যুক্তি গুলো দেখি।

০১. তিনি মিথ্যেবাদী ছিলেন
০২. তিনি পাগল ছিলেন
০৩. তিনি সাহিত্যিক ছিলেন
০৪. তিনি অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে কুরআন কপি/নকল করেছিলেন
০৫. তিনি ব্যক্তিগত ফায়দা লুটতে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন

এর বাইরে তার False Prophethood বা মিথ্যে নবী হবার দাবি করার কোন যুক্তি নেই। আসুন, আমরা এবার অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করি।

০১.

মুহাম্মাদ (স) জন্মের পর থেকে প্রফেট দাবি করার আগ পর্যন্ত তাকে কেউ কোনদিন একটি মিথ্যা কথা বলতে দেখে নি। মুহাম্মাদ (স) এর স্থানীয় উপ ডাকনাম ছিল *"আল আমীন"* যার অর্থ *বিশ্বাসী*। prophethood বা নবী হবার দাবি করার আগে মুহাম্মাদ (স) কে অপছন্দ করতো, এমন কেউ ছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়না। তাকে সবাই সমানভাবেই ভালোবাসতো ও বিশ্বাস করতো। তার কাছে মূল্যবান সম্পত্তি জমা রেখে নির্দ্বিধায় মানুষ থাকতে পারতো। সবচে মজার ব্যাপার, তিনি নিজেকে নবী দাবি করার পর, তার অনেক শত্রু তৈরি হওয়া স্বত্বেও, তারা তার কাছে মূল্যবান সম্পত্তি জমা রাখতো। মক্কায় তৎকালীন মক্কাবাসীরা *"কাবা"*র ভেতরে এবং চারপাশে উপাসনা করতো। সেখানে একটি পাথর স্থাপন নিয়ে দুটি Tribe বা গোত্রের মধ্যে এর ভয়ানক মতভেদ দেখা দেয়। কেউই কাউকে মেনে নিচ্ছেনা। আপাতদৃষ্টিতে কোনরকম বনিবনা হওয়ার সুযোগ দেখা যাচ্ছিলনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা একমাত্র মুহাম্মাদ (স) এর দেয়া সিদ্ধান্তই মেনে নেয়। কারণ তারা তাকে সর্বাবস্থায় বিশ্বাস করতো। তাই তিনি অবিশ্বাসী বা মিথ্যাবাদী ছিলেন, এটা অত্যন্ত হাস্যকর দাবি। ইতিহাস এর বিপরীতেই কথা বলে।

০২.

ইতিহাসে এমন কোন প্রতিবেদন বা বর্ণনা পাওয়া যায়নি, যেখানে মুহাম্মাদ (স) এর জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ৪০ টা বছর ধরে এই ব্যক্তিকে মক্কাবাসীরা চিনতো। কেউ কখনই ধারণা করেনি যে তিনি মানসিক অসুস্থ হতে পারেন। বরং আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, তিনি প্রচুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ঝানু ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যতিমান হয়ে ওঠেন। একজন পাগলের পক্ষে ঝানু ব্যবসা করা অসম্ভব।

০৩.

অনেক বড় একটা তথ্য দিই। মুহাম্মাদ (স) নিরক্ষর ছিলেন। তিনি লিখতে ও পড়তে পারতেন না। তার অক্ষরজ্ঞান ছিলনা। তিনি কিছুই পড়তে পারতেন না। তাই তার মত একজন ব্যক্তিকে সাহিত্যিক দাবি করা যুক্তিবিদ্যার অপমান। যেই কুরআনকে আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন মেনে নেয়া হয়, যেই কুরআনের একটা বাক্যের মত কেউ কখনও তৈরি করতে পারেনি এই ১৪০০ বছরে, যেই কুরআন থেকেই আরবী ব্যকরণের অনেক নিয়ম ধার করা হয়েছে, সেই সুপ্রাচীণ ও অদ্বিতীয় সাহিত্য রচনা করবেন একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, তাও ২৩ বছর ধরে একদিন একদিন করে, কখনও এই অধ্যায় কখনও ওই অধ্যায়, কখনও এই বাক্য কখনও ঐ বাক্য, এইভাবে করে, এটা বিশ্বাস করাই নেহায়েত মানসিক অসুস্থতা।

০৪.

যে ব্যক্তি পড়তে বা লিখতেই পারতেন না, তার কোন খান থেকে কপি করা আকাশ কুসুম ব্যাপার। সেটা ধর্মগ্রন্থই হোক, আর শিশুদের ছড়া- গল্প- কবিতার বই হোক।

০৫.

তিনি যদি ব্যক্তিগত ফায়দা লুটার জন্যেই নিজেকে নবী দাবি করে থাকেন, তবে নিম্নোক্ত দুটি কারণে করতে পারতেন

ক. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও নারীর লোভঃ মক্কায় যে রাষ্ট্র পরিচালনার সংসদ ছিল, সেখানে তাকে বসার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তাকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় সামিল হওয়ার প্রস্তাবও দেয়া হয়। তাকে মক্কার সুন্দর সুন্দর নারীদের উপঢৌকন প্রদানের প্রস্তাবও দেয়া হয়। বিপরীতে এটাই দাবি করা হয়, যে তিনি যা প্রচার করছেন, তা থেকে সরে আসবেন। কারো যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও নারীর লোভ থাকে, তিনি এই লোভনীয় প্রস্তাব কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করবেন না। করার প্রশ্নই আসেনা। কিন্তু মুহাম্মাদ (স) উল্টো বলে বসলেন এক অবিশ্বাস্য কথা, *“আমার এক হাতে চাঁদ আর অন্য হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি সত্য হতে সরে আসবোনা”।*

খ. অর্থবিত্তের লোভঃ ইতিহাস থেকে দেখা যায় তিনি নিজেকে নবী দাবি করার আগে যে পরিমাণ বিত্তের অধিকারী ছিলেন, নবী দাবি করার পর তার কিছুই ছিলনা আর। অনেক বর্ণনায় এটাও জানা যায় তার মৃত্যুর সময় কেবল মাত্র ৭ দিরহাম ছিল তার হাতে। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে তার স্ত্রীকে সেই ৭ দিরহামও মানুষকে দান করতে নির্দেশ দিয়ে যান। তাই অর্থবিত্তের লোভের প্রশ্নই আসেনা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা অভিযোগও তার বিরুদ্ধে যায়না কিংবা কোনভাবেই প্রমাণিত হয়না।

তাহলে তার নিজেকে নবী দাবি করার কারণ আর কিছুই হতে পারেনা, তা সত্য হওয়া ব্যতীত। অর্থাৎ সত্যিই তিনি স্রষ্টার প্রেরিত বার্তাবাহক ছিলেন।

কিছু চমকপ্রদ বিষয় ...

আসুন, কিছু চমকপ্রদ বিষয়ে আলোচনা করি। কুরআনে অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে কি বলা আছে দেখে নিই।

অবাক করা ব্যাপার হলেও সত্যি, কুরআন বাইবেল নিয়ে আলোচনা করেছে। ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের নিয়ে আলোচনা করেছে। মক্কার মূর্তিপূজারীদের নিয়ে আলোচনা করেছে। আমরা আমাদের আলোচিত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কোনটাতেই এভাবে সরাসরি অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ কিংবা ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে আলোচনা করতে দেখিনি। কিন্তু একমাত্র কুরআন এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম। সবচে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়, কুরআনের আলোচনা আমাদের আলোচনার সাথে অনেকটাই মিলে যায়।

কুরআনে ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের Old আর New Testament কে তাওরাত ও ইনজিল নামে উল্লেখ করেছে। এবং ইহুদীদের কাছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে *মূসা (আ)* কে এবং খ্রিষ্টানদের কাছে *ঈসা (আ)* কে প্রেরণ করা হয়েছে বলা হয়। বাইবেলে এই দুইজনের নামই উল্লেখ আছে। MOSES ***(মোসেস)*** এবং JESUS ***(জিসাস)*** নামে। কুরআনে ঈসা (আ) কে অনেক স্থানে *মারিয়াম পুত্র* বলা হয়েছে। বাইবেলে যেই মারিয়াম কে MERRY ***(মেরী)*** বলা হয়। কুরআন ঘোষণা করেছে যে এই দুটি গ্রন্থ স্রষ্টাই প্রেরণ করেছিলেন যথাক্রমে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি। কিন্তু তারা ধীরে ধীরে সেই গ্রন্থগুলোর শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে শেষে সেই গ্রন্থগুলোই পরিবর্তন করে ফেলেছে।

ঈসা (জিসাস) কে দেয়া ইনজিলঃ

“And in their footsteps, We sent ‘Isa, son of Maryam, confirming the Tawrat that had come before him, and We gave him the Injil, in which was guidance and light and confirmation of the Tawrat that had come before it, a guidance and an admonition for Al-Muttaqoon (the pious).**”** [Maa’idah 5:46]

“আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববতী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে পথ প্রদর্শন করে এবং এটি খোদাভীরুদের জন্যে হেদায়েত উপদেশ বানী”

মূসা (মোসেস) কে দেয়া তাওরাতঃ

“Verily, We did send down the Tawrat, therein was guidance and light, by which the prophets, who submitted themselves to Allah’s Will,

judged for the Jews. And the rabbis and the priests [too judged for the Jews by the Tawrat after those prophets], for to them was entrusted the protection of Allah's Book, and they were witnesses thereto.**"** [Maa'idah 5:44]

"আমি তওরাত অবতীর্ন করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন।"

এরপর কুরআন জানিয়ে দিচ্ছে, যে ঈসা আর মূসাকে দেয়া ধর্মগ্রন্থ, তার অনুসারীরা আর মূল অবস্থায় রাখেনি।

"Do you (faithful believers) covet that they will belive in your religion in spite of the fact that a party of them (Jewish rabbis) used to hear the Word of Allaah (the Tawraat), then they used to change it knowingly after they understood it?**"** [Baqarah 2:75]

"হে মুসলিমগণ, তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত; অতঃপর বুঝে- শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল।"

"There is among them a section *who distort the Book with their tongues: (As they read) you would think it is a part of the Book, but it is no part of the Book; and they say, "That is from Allah," but it is not from Allah:* It is they who tell a lie against Allah, and (well) they know it!**"** [Ali Imran 3:78]

"আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে"

"But because of their breach of their covenant, We cursed them, and made their hearts grow hard; they change the words (of ALLAH) from their (right) places and forget a good part of the message that was sent them, nor wilt thou cease to find them- barring a few - ever bent on (new) deceits: but forgive them, and overlook (their misdeeds): for Allah loveth those who are kind.**"** [Maa'idah 5:13]

“অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা (আল্লাহ্‌র) কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন”

কুরআনে স্রষ্টা এটাও উল্লেখ করে দিয়েছেন, যে এই কুরআনের মাধ্যমেই এটা নিশ্চিত করে দেয়া হচ্ছে, যে ঈসা আর মূসার কাছে তিনিই ধর্মগ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন।

“And We have sent down to you (O Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him)) the Book (this Quran) in truth, confirming the Scripture that came before it and Muhaymin (trustworthy in highness and a witness) over it (old Scriptures).**”** [Maa’idah 5:48]

“আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।”

শুধু তাই নয়। কুরআনে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে, যে ঈসা, মূসা সহ আরো অনেক নবীর কাছেই স্রষ্টা ধর্মগ্রন্থ দিয়েছিলেন তাদের জাতিকে পথ দেখানোর করার জন্যে। এই তথ্যটায় বিশ্বাস করা মুসলিমদের জন্যে একটি মৌলিক বিষয়। এটা বিশ্বাস করা ছাড়া কেউ মুসলিম হতে পারেনা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সকল নবীকে বিশ্বাস করা, তাদের কাছে যে ধর্মগ্রন্থ দেয়া হয়েছিল, এই তথ্যে বিশ্বাস করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর বাধ্যতামূলক।

“The Messenger (Muhammad) believes in what has been sent down to him from his Lord, and (so do) the believers. Each one believes in Allaah, His Angels, His Books, and His Messengers. (They say,) ‘We make no distinction between one another of His Messengers’ — and they say, ‘We hear, and we obey. (We seek) Your forgiveness, our Lord, and to You is the return (of all)**”** [Baqarah 2:285]

“রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের (প্রেরিত নবীগণের) প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে”

"O you who believe! Believe in Allaah, and His Messenger (Muhammad), and the Book (the Qur'aan) which He has sent down to His Messenger, and the Scripture which He sent down to those before (him); and whosoever disbelieves in Allaah, His Angels, His Books, His Messengers, and the Last Day, then indeed he has strayed far away." [Nisa' 4:136]

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূলও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সেসমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতদিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।"

সেই ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর বিশ্বাস করার একটি শাখা হল এই, যে সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে গেছে, এটাও বিশ্বাস করা। এই পরিবর্তনে স্রষ্টা ইচ্ছে করেই বাধা দেন নি। তিনি তাঁর শেষ ঐশী গ্রন্থ প্রদানের জন্যেই তা বিকৃত হতে দিয়েছেন। সংরক্ষণ করেন নি। তাছাড়া তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেছেন। তারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েই নিজেদের সুবিধামত এইসব ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন করেছে।

কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (স) এর কাছে কুরআন পাঠানোর পর স্রষ্টা এবার নিজেই ঘোষণা দিলেন যে এই ধর্মগ্রন্থটি আর পরিবর্তন করা সম্ভব না। এটাই শেষ গ্রন্থ। স্রষ্টা এবার নিজেই এর সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

"Verily We: it is We Who have sent down the Dhikr (i.e., the Qur'aan) and surely, We will guard it (from corruption)." [Hijr 15:9]

"আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" স্রষ্টা সাথে এই ঘোষনাও দিয়ে দিলেন যে কুরআনই হল স্রষ্টার পাঠানো সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আর কুরআনের আলোকে দেয়া জীবনযাপন পদ্ধতিই "ইসলাম" হল একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি।

"This day have I perfected your religion for you, completed My favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion." [Maa'idah 5:3]

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থাকে) পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"

অর্থাৎ অতীতের যত ধর্মগ্রন্থ স্রষ্টা নবীদের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন, সবই ছিল নির্দিষ্ট কোন জাতির জন্য ও সময়ের জন্যে। এই কারণে সেইসব ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তিত হওয়া থেকে স্রষ্টা রক্ষা করেন নি। তিনি মানব জাতিকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করছিলেন তার সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থের জন্যে। যেই ধর্মগ্রন্থ মুহাম্মাদ (স) কে দেয়ার পরে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা দেন, যে তিনি নির্দিষ্ট কোন জাতির জন্যে প্রেরিত হন নি। তাকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে। একেবারে পৃথিবী ধ্বংসের দিন পর্যন্ত।

“We sent thee not, but as a Mercy for all creatures.**”** [Anbia 21:107]

“আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।”

“Say: **“**O men! I am sent unto you all, as the Messenger of Allah, to Whom belongeth the dominion of the heavens and the earth: there is no god but He: it is He That giveth both life and death. So believe in Allah and His Messenger, the Unlettered Prophet, who believeth in Allah and His words: follow him that (so) ye may be guided.**”** [Araf 7:158]

“বলে দাও, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর,যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।”

“Blessed is He who sent down the criterion to His servant, that it may be an admonition to all creatures**”** [Furqaan 25:1]

“পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়।”

কুরআনে এটাও বলা হয়েছে এই ধর্মগ্রন্থের সাথে সাথে নবী মুহাম্মাদ (স) ও স্রষ্টার শেষ বার্তাবাহক।

“Muhammad is not the father of any of your men, but (he is) the Messenger of Allah, and the Seal of the Prophets: and Allah has full knowledge of all things.**”** [Ahzaab 33:40]

“মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন;বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।”

কি অদ্ভুত বিষয়। আমরা যখন Old আর New Testament নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন আমরা স্পষ্ট দেখেছি তা কিরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। কুরআনও ঠিক একই কথাই বলছে। আবার কুরআন দাবি করছে এই ধর্মগ্রন্থ (কুরআন) কখনই পরিবর্তিত হতে পারেনা। এবং আমাদের কুরআন সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা সেটারও সত্যতা পেয়েছি।

এসব কি শুধুই কাকতালীয়?

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল কুরআন বাইবেলের অবতরণকে সত্যতা দান করে। কিন্তু বাইবেলের বর্তমান অবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে। কুরআন বাইবেলে বর্ণিত বেশ কিছু নবীর অবতরণকেও সত্যতা দান করে। কিন্তু তাদের প্রচার করা যে মূল বক্তব্য, তাদের অনুসারীদের দ্বারা সেটা পরিবর্তিত হয়েছে বলেও দাবি করে। যার যৌক্তিকতা আমাদের আগের আলোচনাতেও প্রমাণিত হয়েছে।

শুধু Old আর New Testament নয়। কুরআন অন্যান্য হাজার হাজার ধর্মের অস্তিত্বের চিরাচরিত প্রশ্নেরও একটা সহজ উত্তর খোঁজার দরজা খুলে দেয়। কুরআন উল্লেখ করে, যে স্রষ্টা প্রতিটি জাতির কাছেই একজন বার্তাবাহক বা নবী পাঠিয়েছেন। সেই বার্তাবাহকের দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র তার সেই জাতির কাছেই সেই বার্তা পৌঁছানো। সেই বার্তাটা ছিল অদ্ভুতভাবে সকল ক্ষেত্রেই এক। স্রষ্টার একত্ববাদ। কুরআন বলছে,

"For We assuredly sent amongst every People a messenger, (with the Command), "Serve Allah, and eschew Evil/Tagoot.**"** [Nah l 6:36]

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (আল্লাহ্ ব্যাতীত অন্য যাকে ইবাদর করা হয়) থেকে নিরাপদ থাক।"

"Not a messenger did We send before thee without this inspiration sent by Us to him: that there is no god but I; therefore worship and serve Me**"** [Anbiya 21:25]

"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।"

এতে করে একটা বিষয় সম্পর্কে ধোঁয়াশা কেটে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থেই কোথাও না কোথাও স্রষ্টার একত্ববাদের কথা এসেছে, সুতরাং এটা হতেই পারে যে এটা স্রষ্টার পক্ষ থেকে এসেছিল কোন নির্দিষ্ট জাতির জন্য। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা বিকৃত হয়ে যায় আর আগের অবস্থায় থাকেনি। তাই আমরা দেখতে পাই প্রায় সব ধর্মগ্রন্থেই স্রষ্টার একত্ববাদের উল্লেখের সাথে সাথে স্রষ্টার সাথে অন্য কারো তুলনা বা Partnership এর উল্লেখও থাকে। স্পষ্টতই তা পরিবর্তনের চিহ্ন।

প্রিয় পাঠক!

আমাদের কাছে ধীরে ধীরে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে কুরআনই হল একমাত্র সত্য বাণী। কারণ -- একমাত্র এই কুরআনই ধর্মগ্রন্থের ঐশী হবার বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ৪ টি মানদন্ডতেই উত্তীর্ণ হয়েছে।

মুহাম্মাদ (স) নিজে এই কুরআন লিখেন নি, এটা তার কাছে স্রষ্টা থেকে আসা ছাড়া আর কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই, সেটাও আমরা যৌক্তিকতার মাধ্যমে দেখেছি।

একমাত্র এই কুরআনই এত এত ধর্মের অস্তিত্ব নিয়ে তোলা প্রশ্নের সহজ সমাধান দান করে। অন্যান্য ধর্ম যেখানে এই বিষয়ে কথাই বলেনি, সেখানে এই কুরআনই আমাদের দেখিয়ে দেয়, যে অতীতে অনেক ধর্ম স্রষ্টা কিছু জাতির জন্যে প্রেরণ করলেও স্রষ্টা সেসব ইচ্ছে করেই রক্ষা করেন নি। ফলে তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্রষ্টা তাই সর্বশেষ ধর্ম প্রেরণ করেছেন ইসলাম। আর ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কুরআন এখন অবিকৃত আছে, কারণ স্রষ্টা নিজেই ঘোষণা করেছেন এটার সংরক্ষণের। তাই যেখানে অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো বাকি ধর্মগুলোকে আমলেই নেয়না, বা আলোচনাই করেনা, সেখানে শুধুমাত্র কুরআনই এই ব্যাপারে আলোকপাত করেছে আর সবচে সহজ ভাষায় তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছে।

প্রিয় পাঠক!

আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে শুধুমাত্র যৌক্তিক বিচার আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখতে পাচ্ছি একমাত্র কুরআনই সত্যিকার অর্থে ঐশী বাণী। যুক্তির মানদন্ডে যখন অন্যান্য গ্রন্থগুলো বিকৃত, যুক্তিহীন ও পরিবর্তিত প্রমাণিত হল, সেখানে শুধুমাত্র কুরআনই তার অনন্যতা ও অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

তাই পাঠক! আপনি কি এখনও সত্য গ্রহণ করতে চাইবেন না? আপনি কি এখনও এমন কোন ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে চাইবেন, যার কোন মৌলিক ঐশী ভিত্তিই নেই? আপনি কি এমন একটা ধর্মকে পরিত্যাগ করছেন, যেটা সত্যিকার অর্থেই স্রষ্টা প্রদত্ত? আপনি কি এখনও ইসলামকে একটা নিতান্তই বিশ্বাস মনে করেই থাকবেন? শুধুই একটা ধর্ম মনে করে থাকবেন? যৌক্তিকতার সকল মানদন্ডে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া একমাত্র গ্রন্থ কুরআনকে পরিত্যাগ করবেন?

আমরা প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিলাম আমাদের এই ছোট্ট আলোচনা হবে শুধুমাত্র যৌক্তিকতার ভিত্তিতে। তাই যদি সেই ধারাতেই শেষ করতে যাই, তাহলে আমাদের কুরআনকেই একমাত্র স্রষ্টার বাণী হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ নেই। সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে ঐশী বাণী হিসেবে প্রমাণিত হবার পরেও কুরআনকে মেনে না

নেয়া কিংবা অন্যান্য প্রমানিত পরিবর্তিত, যুক্তিহীন ও বিকৃত গ্রন্থকে ঐশী বলে অন্ধ বিশ্বাস করা অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক।

তাই প্রিয় পাঠক! আসুন! সত্যকে স্বীকার করুন। সত্যকে আলিঙ্গন করুন। সত্যকে মেনে নিন। যৌক্তিক ভাবেই কুরআনকে একমাত্র স্রষ্টার বাণী হিসেবে আর ইসলামকে স্রষ্টা মনোনীত জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিন। মিথ্যে ও অন্ধ গোঁড়ামিকে পরিত্যাগ করুন।

সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হোন। ইসলামের আলোয় আলোকিত হোন।

শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র আনুগত্যের এই আলোকিত জীবন ব্যবস্থায় আপনাকে দু'হাত মেলে স্বাগতম।